KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সাদার্ন মার্কেট প্লেস, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : Award Issue 6/3 6/4 7/2	Year of Publication : April 1983 April-June 1983 July-Sep 1983 May 1984 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২১

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সম্পাদকীয়

"দৈনিক সংবাদপত্র" আজকাল হয়ে উঠেছে 'দৈনিক দুঃসংবাদপত্র'। আজকাল যে কোনো সংবাদপত্রের প্রথম পাতার দিকে তাকালে দেখা যাবে মানবজাতির পক্ষে সমস্তরকম অহিতকর সংবাদেরই মূলত প্রাধান্য। বন্যা, খরা, লোডশেডিং, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা, ব্যাঙ্কডাকাতি, ঘেরাও, কর্মবিরতি, গো স্লো, দলবদল—এই সব স্নায়ুবিবশকারী দুঃসংবাদ পড়লে কি লাভ? বা না পড়লেও ক্ষতি কি! পার্কের বেঞ্চবুড়োরা ছাড়া এসবের নিষ্ফল কণ্ডুয়ন আজকাল কেউ করেন না।

যে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে, যারা বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে তারুণ্যে পা রাখছে, তাঁরা অধিকাংশই সংবাদপত্র পড়তে সুরু করে শেষ পাতা থেকে। খেলার খবর বা সিনেমাবার্তা ছাড়া কিছু তাদের পাঠ্য বলে মনে হয় না। কাহাতক আর ইন্দিরা মানেকা ঝগড়া, "রাজীব আমার উত্তরসূরী নয়"—ধরণের সংবাদ মানুষকে ধরে রাখতে পারবে! যদিও সেকস্ স্কাণ্ডাল থেকে পলিটিক্যাল স্কাণ্ডাল আজকাল বেশী লালা নিঃসরণকারী, হায়! তাওতো প্রায় পুরোনো হয়ে এলো!

পাঞ্জাব আসাম নিয়ে লক্ষ লক্ষ কুইনট্যাল নিউজপ্রিণ্ট ও কালি নষ্ট হলো। সমস্যার সমাধান তবু বায়বীয় স্তরেই রয়ে গেল। আসলে এক সমস্যা দিয়ে অন্য সমস্যার কাঁটা তোলবার ইচ্ছাই এখন প্রকট। তবু বরাহবপু প্রফেশনাল নেতারাইতো দেখছি এখনো ভোটে জিতে বারবার ফিরে আসছেন একবার এ না হয় ও। অন্যবার ও না হয় এ। এত বড় দেশে বোধহয় গণ্ডা দশেক নেতা ছাড়া নেতা নেই!

গান্ধীজির পায়ে হাঁটা, বিনোবার ভূদান বা জংগলদান যজ্ঞের কারণে পদযাত্রা—আজকের তথাকথিত তরুণ চন্দ্রশেখরকেও যখন ওই সুলভ পন্থায় আক্রান্ত হতে দেখি তখন তা উপহাসেরও অযোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামকে জানবো, জনতাকে বুঝবো বলে এই যে সচন্দন গন্ধপুষ্প ভূষিত চন্দ্রশেখর হাঁটলেন—এই হাস্যকর গিমিকের পর তরুণ প্রজন্মের কথা সাতকাহন করে লিখতে হবে, এবং আমাদের—আমরা যারা ভারতের মাত্র শতকরা তিরিশ ভাগ অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন তারা রোজ সকাল হলেই পড়তে বসবো।

একথা যেন কেউ ভুলেও না মনে করেন আমরা সংবাদপত্র প্রকাশ ব্যাপারটাতেই সন্দিহান। যা চাই আমরা তা হোলো এই ভণ্ড রাজনীতি-ব্যবসায়ী নেতাদের খবরকে আর প্রাধান্য না দিয়ে দেশের অন্যান্য মৌলিক সমস্যার প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া। বলা বাহুল্য, এটা দাবী নয়, সবিনয় প্রার্থনা।

"এই সময়" গ্রন্থটির জন্য এ বছর বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নির্বাচকদের সাধুবাদ দিই। যোগ্যতম গ্রন্থটিকেই এবার তারা নির্বাচিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে এমন আচ্ছন্নকারী গ্রন্থ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলার রেনেসাঁ ও নবজাগরণের সঙ্গে সংপৃক্ত মনীষীদের প্রসঙ্গে তথ্য বা তত্ত্বের ব্যাপারে সুনীল স্বাধীনতা নিয়েছেন, বা ইচ্ছে করেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়েছেন, একথা যারা বলেন তারা গ্রন্থটি পড়েন নি বলেই মনে হয়! মূল চরিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রে বা অন্যান্য কিছু চরিত্রে খানিক কল্পনা হয়তো আরোপিত হয়েছে ঠিকই, সেটা সাহিত্যের প্রয়োজনেই হয়েছে মূল তথ্যগুলি মোটামুটি অক্ষুন্ন রেখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের অভিনন্দন।

বিভাবের আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য-সংখ্যার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
আষাঢ় সংখ্যা ১৩৯০
বিভাব

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।
লাড্‌লী মোহন রায়চৌধুরী ১৭

পুরাতনী

হেমন্তবালাদেবীর একটি অপ্রকাশিত কবিতা।
জয়ন্তী সান্যাল ২১

শিল্পভাবনা

সত্যের নৃত্যছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জে. সুলতান আলী
ভাষান্তর। মুকুল গুহ ২৬
গান্ধী। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভবিষ্যতের জালানী। অভী সেনগুপ্ত ৩৭

প্রবন্ধ

ভারতীয়দের ইংরাজী চর্চা ও রাজা রাও। এষা দে ৪৯
জেলার সংবাদপত্র : কিছু তথ্য কিছু কথা। প্রদীপচন্দ্র বসু ১০৫

কবিতাগুচ্ছ

রণজিৎ দাশের কবিতা। মল্লিনাথ গুপ্ত ৭৫
মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা। দীপক সেন ৮৮

গল্প

মৌলিক জিজ্ঞাসা । অনীশ দেব ৮০
বিস্মরণ । সুধাংশু ঘোষ ৯৩
কলকাতার কুয়াশায় । কিন্নর রায় ১০০
মর্যাদা । মৃণাল চৌধুরী ১১৬

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

প্রদীপ দাশগুপ্ত শচীন দাশ
সুবিমল লাহিড়ী দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস । কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ / অনুপ রায়
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়্যান্ট্ প্রসেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯ এবং করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

লাডলী মোহন রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। চিঠিখানি বাংলা সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর কাছে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লিখিত হয়েছিল। এই চিঠিতে কবি সরকারের পুলিশ বিভাগের কোন কোন কাজে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। কবির মনে হয়েছিল যে পুলিশের লোকেরা তাঁর নানা প্রতিষ্ঠানের উপর অশোভন ভাবে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণেই তাঁর আপত্তি—চিঠিখানি স্বভাবতই ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল। চিঠিখানির প্রথম কয়েক লাইন বাদ দিয়ে (বাধ্যতামূলক সরকারী কারণে) আমরা সবটুকুই হুবহু উদ্ধৃত করছি। কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। তথ্যগুলি জানা থাকলে চিঠিখানি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

সকলেই জানেন পল্লী সংস্কার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলেন। কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত তাঁর জমিদারী এলাকায় কবি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা রকম সংস্কার প্রবর্তন করেন। এখানে তিনি চারজন সার্কেল ইন্সপেক্টর নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে দেশীয় পদ্ধতিতে বোনা সুতী কাপড় বিক্রয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি শিলাইদহ ও পান্তি অঞ্চলে একাধিক পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।

পল্লী সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন সেই কাজে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন যুবক স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে এগিয়ে আসেন। অতুল সেন প্রমুখ এই রকম কয়েকজন যুবক কবির পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য উপস্থিত হন। এঁদের সহায়তায় চিকিৎসাবিধান এবং সালিশি আদালতের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি প্রভৃতি নানা রকম গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। কালীগ্রাম পরগণার পতিসর, কামতা ও রুতোয়াল, এই তিনটি গ্রামেই প্রধানত এই সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই সব কাজে আশানুরূপ সাফল্যও অর্জন করা গিয়েছিল।

কিন্তু রাজনীতির থেকে সংশ্রবমুক্ত এই ধরনের গঠনমূলক পল্লী সেবার কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। ইতিপূর্বে ১৯০৮ সাল নাগাদ কবির জমিদারীর অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায়, পল্লী সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি পাঁচ জন যুবাবয়স্ক মণ্ডল-অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন—কিন্তু পুলিশের সন্দেহ দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়ায় এই সকল যুবকেরা পল্লী সংগঠনের কাজে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, ১৯৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড ২২৯ পৃষ্ঠায় এই সকল যুবকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।) আট বছর পরে পূর্বে উল্লিখিত অতুলচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পুনরায় যে গ্রামসেবার কাজ গ্রহণ করা হয়, পুলিশের তৎপরতার ফলে তাও বন্ধ রাখতে হয়। বর্তমান চিঠিতে পুলিশের এই ব্যাপক নজরদারির বিরুদ্ধেই কবি আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখছেন :

"...To my regret, one of the two of my Bolpur students (whom I wished to take with me to Japan) was refused by the Police Commissioner though I was prepared to take the responsibility of having him with me. I feel that this continual attitude of suspicion and distrust towards the students is sure to lead to a result opposite to that which is desired or is desirable.

There is one example of this police suspicion which I would wish you to deal with while I am away. On my estate at Patishar, Rajshahi District, I have started various forms of social improvement to which the villagers are responding. But this very response has brought in the police, and Atul Chandra Sen, who is acting in these matters for me has been placed under police surveillance. I have every desire that what I do on my estate should be perfectly open to Government and if there is any doubt on the part of the police about what I am trying to accomplish, I am ready to explain it to them; and my nephew Surendra Nath Tagore of 19 Store Road, Ballygunge, will do so in my absence. There is nothing easier then to kill the young life which is growing up in my country but there is nothing more derogatory to good Government.

Might I ask you to help us, while I am away, to prevent police suspicion of this harmful kind interfering with my work among my tenants? This work has meant a considerable sacrifice to me and it has led to results which have been encouraging, I trust that all that has been done will not now be undone.

I am taking Mr. Pearson and Mr. Andrews with me, and we would all wish to send to you and Mrs. Gourlay our kindest remembrances as we take our leave.

Yours very sincerely
Rabindra Nath Tagore.

উল্লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে পুলিশের সদা সর্বদা সন্দেহের মনোভাব পোষণ করার ফলে যে অমঙ্গলজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে সেই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গাব্দ ১৩২২-এ 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত 'ছাত্র শাসনতন্ত্র' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে কবি রাজপুরুষদের তরফে ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বর্তমান চিঠিখানিতেও ছাত্রদের সম্পর্কে কবির সেই একই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে ছাত্রদের ক্রমাগত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলে ফল খুব শুভ হবেনা।

আগেই বলা হয়েছে যে পতিসরে রবীন্দ্রনাথের সমাজ সেবা কেন্দ্রগুলির উপর পুলিশ যে নজর রেখেছিল সেটা তাদের তরফে কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও এই ব্যাপার ঘটেছিল। বস্তুত কবি নিজেও পুলিশের সন্দেহ

তালিকায় ছিলেন। পুলিশের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে এর প্রমাণ আছে ১৯১৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের এই রকম একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে কবিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে পুলিশ যে চিহ্নিত করে রেখেছিল সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে করবেট নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জে. ই. কামিং নামক অপর একজন রাজপুরুষের কাছে লেখা আর একটি গোপন চিঠিতে কবিকে ইংরাজের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করেন (No doubt Sir Rabindra, with his great influence, is a danger.)। মনে রাখতে হবে কবিকে এই ভাবে যে সময়ে সন্দেহের চোখে রাখা হয়েছিল সেই সময় তিনি কেবল পল্লী সংগঠনের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন।

উদ্ধৃত চিঠি খানিতে কবির জাপান যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। জাপান যাত্রায় সঙ্গী হিসেবে কবি বোলপুরের যে ছাত্রটিকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হন, তাঁর পরিচয় আমরা এখনও জানতে পারিনি। আমরা কেবল জানি যে উক্ত চিঠিখানি লেখার মাত্র কয়েক দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের ৩ মে তারিখে জাপানের পথে যাত্রা করেন এবং এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এনড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। এনড্রুজ সম্পর্কে সরকার আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না, ইংরাজের পুলিশ তাঁকে sentimental agitator হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা প্রসঙ্গে সরকারের তরফে নানা রকম সন্দেহের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। পুলিশ অভিযোগ করেছিল যে জাপানে প্রবাসকালে কবি নাকি গোপনে গোপনে নানা রকমের সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। জাপান যাত্রার প্রাক্কালে কবি বাংলার গভর্ণর লর্ড কার্মাইকেলের কাছ থেকে জাপানের ব্রিটিশ রাজদূতের নামে একটি ব্যক্তিগত চিঠি সঙ্গে নিয়ে যান। এই জন্য লণ্ডনের ভারতসচিব স্বয়ং কার্মাইকেলের প্রতিও বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন।

মোট কথা উদ্ধৃত চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কার্যাদি সম্পর্কে তৎকালীন সরকার কি মনোভাব পোষণ করতেন, তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই কারণেই চিঠিখানির এত গুরুত্ব।

পুরাতনী

হেমন্তবালাদেবীর একটি অপ্রকাশিত কবিতা

জয়ন্তী সান্যাল

রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ করুণা লাভ করেছিলেন যে কজন তাঁদের অন্যতমা ছিলেন হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল সুসংস্কৃত মনের অধিকারী। জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে প্রকৃতির অনন্ত রূপমাধুরী প্রতিমুহূর্তে যে বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করে, রূপ মুগ্ধা হেমন্তবালা ছিলেন সেই রস সৌন্দর্যে নিবিষ্ট। মাত্র পনেরো বছর বয়সে মায়ের ইচ্ছায় বৈষ্ণব ধর্মে পুণ্যাভিষিক্তা হয়েছিলেন। সেই ধর্মকে তিনি প্রাণপণ আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন, ধর্মনিষ্ঠার জন্য এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসার জন্যও। চিরাচরিত আচার নিয়ম ইত্যাদি পালন করতেও চেয়েছেন অনেকটা সেই ভালোবাসার প্রতি আনুগত্য থেকে। তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল বৈষ্ণবীয় ধর্ম সাধনার অঙ্গ-সমারোহ ভরা অনুষ্ঠানগুলি, এর সুন্দর সুরচিত বিগ্রহ মূর্তিগুলি। নিতান্ত কিশোরী বয়সে এই ধরণের সুন্দরের প্রতি মোহ, রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর থেকে হেমন্তবালা দেবী ছিলেন সংসার ও সমাজের একান্ত অন্তঃপুরের মানুষ। যেখানে স্নেহে প্রেমে, ভক্তি ও ভালোবাসায়, বন্ধুত্বে ও শ্রদ্ধায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ, সেখানেই বাসা বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম সাধনা তাঁর গুরু আশ্রমে পূর্ণতা লাভ করল না সেখানকার সনাতনী আবহাওয়ায়। আবার সংসারের নানা বাধা-বন্ধনময় তিক্ত অভিজ্ঞতায় ওদিকে যেতে চাইলেন না। এমনই মানসিক সঙ্কটের সময়ে হেমন্তবালা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীর সঙ্গে যেন এক গভীর আত্মীয়ভাব অনুভব করে অভিভূত হয়ে ছদ্ম-নামে কবিকে পত্রে জানালেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। তারপর রচিত হল দুজনের মধ্যে

দীর্ঘ দশবছরের "সম্পর্ক", প্রধানতঃ পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর 'জীবন দেবতা' হয়ে কাছে এলেন। ঝড়ে বিক্ষুব্ধ দিক্‌ভ্রান্ত এক পাখিকে আশ্রয় দিতে, নির্ভরতার আশ্বাস দিতে।

অতি অল্প বয়স থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হেমন্তবালা অজস্র রচনা সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন—পদ্যে গদ্যে প্রবন্ধ উপন্যাসে গল্প ও রূপকথায়। অজস্র পত্র ধারার প্রবাহ তো চলতোই অনবরত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বেশি কিছুই লিখে যাননি। তার কারণ হিসাবে 'আমার মনের কথা'য় এক জায়গায় লিখেছেন—

"…আমার খাতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না থাকায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য, পদ্য ও গদ্য, জল ও স্থল, মিষ্টান্ন ও সাদা অন্ন, আকাশ ও পৃথিবী, সোনা ও লোহা, এগুলিতে যেমন প্রভেদ, চন্দ্র ও প্রদীপে যেমন প্রভেদ, আমার মনের কথা ও রবীন্দ্রকথায় সেই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ আমার রোমান্টিক মনোজীবনের সঙ্গী নন। বাস্তব ও সংসারী জীবনেরই নির্ভর। তাঁকে নিয়ে কবিত্ব করা সাজে না। তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথাই তেমন ভাবে বলার যোগ্যতা আমার নাই।"

অথচ, এর আগে ১৩৬২ সালের ২৫শে বৈশাখে, পুরীতে হেমন্তবালা দেবী কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। 'পুণ্যস্মৃতি' নামক সেই কবিতাটি এতদিন আড়ালেই লুকানো ছিল। কারণ কবির সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতি জড়ানো আছে এই লেখায়। যিনি তাঁর আত্মার আত্মীয়, বন্ধু ও সখা। শ্রদ্ধাভাজনীয় কবিগুরু ছিলেন এমনই একজন যাঁর কাছে হেমন্তবালা সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণার সান্ত্বনা লাভ করতেন। ধর্মীয় ও সাংসারিক নানা সমস্যার বিষয়ে পারস্পরিক সহজ আলাপ আলোচনায়, পত্রের মাধ্যমেই কত নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর লাভ করতেন। এমন মনোযোগ দিয়ে, এত গভীর সমবেদনা নিয়ে কবির মত আর কেউ তাঁর কথা শোনেন নি। গুরু আশ্রমের ও সংসারের ভয়ে কবির স্মৃতিকে বাইরের আলোতে এনে মলিন হতে দেননি তিনি। লোকে পাছে ভুল বোঝে এই ছিল তাঁর ভয়। মনে হয় নিতান্ত যুক্তি দিয়ে বিচার করে 'মনের কথায়' তিনি যা লিখেছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ তার আগে রচিত এই কবিতাটি লেখিকার রোমান্টিক মনোজীবনেরই প্রতিফলন। হেমন্তবালা ১৯৭৬ সালের ১লা জুন পরলোক গমন করেছেন। এখন কবিতাটি প্রকাশের কোনই বাধা নেই।

'পুণ্য স্মৃতি'

হেমন্তবালা দেবী

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগেকার একটি রাত্রি।
সেদিন চোদ্দই আষাঢ়।
ক্ষান্ত বর্ষণ মেঘ আকাশে।
রূপকথার রাজপুত্রকে সেদিন আমার প্রথম দেখা।
বাহিরে যাত্রাদলের নারদমুনির সাজ,
তদুপরি মোগল বাদশাহের খানদানী পোষাক,
বীণা-বিনিন্দিত সুরে তাঁর সেই প্রথম সম্ভাষণ,
"তুমি কেমন আছ?"
অস্পষ্ট অব্যক্ত আলো আঁধারিতে,
রূপকথার নিদালী মহলে
নীল আলোর ঈষৎ সম্পাতে
দেখা দিলেন কল্পরাজ্যের বিক্রমাদিত্য
বস্তুরাজ্যের সীমানায়।
অভিভূত অন্তঃকরণে প্রণাম করলেম তাঁর পায়ে,
মনে হ'ল তীর্থ স্নান করে উঠলেম যেন।
ভুলে গেলাম কতশত ব্যবধান আমাদের মধ্যে।
একমুহূর্তেই সেই অচিন দেশের বিদেশী রাজা
চেনা মহলের দাদাঠাকুর হয়ে দিলেন দেখা।
তারপর থেকে,
দশটি বছরের কত দিন, কত রাত্রি গেছে
নূতন নূতন অপূর্ব অভাবনীয় স্বপ্নমাঝে।
কে জানতো এই অবহেলিত বাংলাদেশের
অবহেলিত রাজধানীর প্রত্যন্তসীমানার গলিতে
অশিক্ষিতা গৃহস্থবধূর বুকে জেগে উঠবে
ঘুমন্ত কল্পনা জগতের সোনালী কন্যা।

যার ছবি চিরদিন এঁকেছে শিল্পী।
যার গাথা চিরদিন গেয়ে এসেছে চারণেরা,
কাব্য রচেছে কবি যার জীবন কথা নিয়ে।
কে জানতো দুলর্ভ কোন মাহেন্দ্রলগ্ন দেখা দেবে
অদৃষ্টের ঈষৎ কৌতুক স্মিত প্রসন্ন মুহূর্তে।
ভেঙে গেল এক নিমেষে সহস্রযুগের বাধাবিঘ্ন ব্যবধান,
ভেঙে গেল অচলায়তনের পাষাণ প্রাচীর।
যোদ্ধবেশে রাজবেশে প্রিয় বয়স্য এসে দাঁড়ালেন
মূঢ় মুগ্ধ এক গ্রাম্য বধূর সম্মুখে।
সদ্বন্ধ রচিত হোলো কৌতুকে কৌতুকে
হাস্য পরিহাসের
দাদা নাতনী সুবাদ নিয়ে।
কখন যে ভাগ্যসূত্রে জটিল গ্রন্থি পড়ে গেছে
বাঁধনে বাঁধনে শত পাকে!
একটুও বুঝতে পারিনি।
কত হাসি, কত অশ্রু, কত সুখ দুঃখ ভাব ভাবনা,
কত মিথ্যা অভিনয় সত্য কাহিনী রচনার।
নিজের মনকে না চেনা,
না জানা আরেক জনের মনকে।
কৌতুক পরিহাসের শ্লেষ কথা
কখন যে জীবনের শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়!
কতদিন কেটে গেছে—
নূতন নূতন অনির্বচনীয়কে আবিষ্কার করে।
ভেবেছি, খুব ফাঁকি দিয়েছি বুঝি,
না, না, ফাঁকে পড়ে গেছি, নিজেই।
ভেবেছি, কেমন ঠকিয়েছি তাঁকে,
ঠকাইনি, ঠকেই গেছি আমি আপনিই।
তারপর বাইরে থেকে আসে কত অবাঞ্ছিত বাধা
কত পরিবাদ, কত গঞ্জনা।
বুঝতে পারি না যে কেন আসে।

আমি তো করেছি শুধু খেলা খেলা অভিনয়,
করিনি তো সত্যিকার খেলা।
কিন্তু না খেলা, না অভিনয়
কখন অদৃষ্ট গড়ে তুলেছে এক স্বপ্নময় ইতিহাসকে
সত্যরূপ নিয়ে এই জীবনের লৌহ পাষাণে।
অসম্ভবও সম্ভব হোলো।
কেমন করে কাটলো সংসার বন্ধন।
কেমন করে হোলো একা একাকী জীবনের সুরু।
কেমন করে বস্তুরাজ্য পেরিয়ে দেখা দেয়
ভাবরাজ্যের বাণী রূপ।
আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে।
তোমরা ভাবো, আমি আছি একাকিনী।
আমিও তাই ভাবি।
কেউ তো জানেনা আকাশে আরক্ত পূর্বাশার
যে প্রথম তারা,
সেই তারাটি আমার তিনি।
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে আসেন আমাকে,
আমি কেমন আছি।

২৫শে বৈশাখ
১৩৬২
পুরী

শিল্পভাবনা

সত্যের নৃত্যছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জে. সুলতান আলি
ভাষান্তর : মুকুল গুহ

স্বাধীনতা সৃষ্টিশীল শিল্পের আবাহন করে। সত্যকে বিধৃত করাই হ'ল সৃষ্টকর্মের যাবতীয় প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মের উৎস তাঁর আত্মমগ্নতার গভীরে, সত্যকে উপাসনা করার সাবলীলতায়, ছন্দ, রেখাঙ্কন আর ভঙ্গীর গভীর সঞ্চালনের মধ্যে। যে সাবলীল ভঙ্গিমায় খোলা মনে তিনি ছবি এঁকেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। তিনি তার দৃশ্যকল্পকে নিজের সত্তার বাইরে থেকে অবিষ্কার করেন, সেইসব দৃশ্যকল্পকে অনন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, তারপর তিনি সৃষ্টি করতে যখন তৎপর হয়ে ওঠেন তখন তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে বস্তু ও ব্যক্তিজগতের এক অপূর্ব অন্বয়। তাঁর চিত্রকলা কখনও অস্পষ্ট, কখনও তাঁর ছবির ফর্ম হয় খেয়ালী, তখন হয়ত মনে হতে পারে কোনো শূন্যতার শিকড় থেকেই সেইসব টেনে আনা হল। কিন্তু তার চিত্রশিল্প অনুধাবন করলে স্পষ্ট হবে যে আমাদের এই অবয়বহীন জীবনের মধ্য থেকে সৃষ্টিমূলক অবয়ব সৃষ্টি করতেই তিনি তৎপর। আন্তরিক মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কি কখনও শুদ্ধ নন্দনত্ব কিংবা কেবলই ছন্দ সৃষ্টির নেশার কথাই ভেবেছিলেন? কিংবা খ্যাতির জন্য? না কি শিল্প সৃষ্টির গভীর তাগিদেই সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? অবশ্যই নয়। তাঁর মনটাই ছিল সৃষ্টিশীল, একটি মন, যে মনে গভীর স্বচ্ছতা সর্বদা বিদ্যমান ছিল; যে মনে চিন্তার স্বচ্ছতা থাকে সেই মন সহজেই বিশ্বকে এবং নিজেকে জানতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যের

অনুসন্ধানে ব্যপৃত ছিলেন, অবশ্যই তার নিজের মতন করে। তাঁর তৃষ্ণা ছিল আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির। এই তৃষ্ণা আর এই প্রজ্ঞা তাকে দিয়েছিল এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যে অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বের বিচিত্র রূপময়তা যে অনবদ্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতিকে দেখার এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি অনিত্য বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের অনুভবে এনেছিল আত্মনির্ভরতার, একাত্মতার এক অপরূপ ছন্দিত রূপ। স্বভাবতই তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, গভীরে ছিল তার অন্তর্দৃষ্টি—তাই এই বিশ্ব কোন মহাবিশ্বের মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে বিশালে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছে সেই রহস্য পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বোধিতে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের পরিভাষা নয়, সৃষ্টি হয়নি সেই সব জ্ঞানের পরিমণ্ডল থেকে শুধু—বরং তাঁর চিত্রকলা সৃষ্ট হয়েছিল এক ব্যপৃত জীবনবোধ থেকে, যে জীবন চলমান, তার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, একটি দিন সেখানে অন্যদিনের থেকে আলাদা, অপ্রত্যাশিত, সজীব ও সাবলীল। রূপ, সুর ছন্দ, অঙ্গসজ্জা, রহস্য, সৌন্দর্য আর চৌম্বকাকর্ষন আমাদের মুগ্ধ করে, সেই সব ছাড়াও তার চিত্রকলা উন্মোচিত করে আরো এক সত্য। কি সেই 'সত্য'? এই সত্যে উপনীত হতে হলো চিত্রকল্পকে স্বভাবতই তার সর্ব-চিত্রময়তাকে বিসারিত করতে হয় তার মজ্জা ও মূল্যবোধ, তার ভঙ্গীকাঠামোর সারল্যে, প্রোথিত করতে হয় সূক্ষ্ম গভীরে, বিসর্জন দিতে হয় অনাবশ্যক ও ভ্রান্তিমূলক অঙ্গসজ্জা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা উত্তীর্ণ হয়েছে এমনই এক পরিব্যপ্ত সূক্ষ্ম গভীরতার মধ্যে যে সে মাধ্যম আলোকিত করতে পারে মানবসভ্যতাকে এবং অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে, অনুকরণ, তা সে যেভাবেই করা হোক না কেন সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেনা। আসলে অনুকরণের মধ্যে উন্নয়ন নেই। মানুষের এক দুঃখজনক পতনের রূপই অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনার মধ্যে বারংবার এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, এবং তার চিত্রগুলিও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে; শুধুমাত্র প্রকৃতি নয় আরও অনেক কিছু থেকেই মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, যিনি এরকম শিক্ষাগ্রহণে অস্বীকৃত হন তাকে মৃত বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আমরা কিভাবে এইসব শিক্ষা আমাদের আয়ত্বাধীন করতে পারি? রবীন্দ্রনাথের উত্তর সে প্রশ্নে এই, যে

ব্যক্তিসচেতনতাই সমস্ত সৃষ্টিক্ষেপের মূল উৎস। একটি ছবি তার নানারকম বৈপরিত্য ও বক্তব্য নিয়ে দর্শককে সেই শিল্পকর্ম-দর্শনে নিয়োজিত করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে দর্শকসাধারণও আসলে ওই শিল্পটির স্রষ্টা, কারণ দর্শকের চেতনার মধ্যেও রয়েছে শিল্পটির স্থান। রয়েছে তার প্রয়োজনে, তার গ্রহণে, এমনকি বর্জনেও। অর্থাৎ শিল্পকর্ম সৃষ্টি ও বুদ্ধির ক্রমাগত প্রয়াস মাত্র। বস্তুজগতের সামগ্রী হয়েও তাই চিত্রশিল্পে সবসময়েই রয়েছে ভিন্নতর বক্তব্য, দৃশ্যরূপ কিংবা বোধির রূপান্তর। চিত্রশিল্প, সুতরাং, 'দৃষ্টি অনুভব', অর্থাৎ দৃশ্যগ্রাহ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রেখা আর ছন্দের প্রতি তাঁর গুরুত্ব আরোপ করার প্রতি অতি সতর্কতা। তাঁর চিত্রের বাকি অংশ অর্থাৎ বক্তব্য, চিত্ররূপ, ইত্যাদি সবই যেন গৌন। যথার্থই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমার শিল্পকর্ম কাব্যের রেখাঙ্কন মাত্র। যদি কোনদিন, এইসব চিত্রমালা স্বীকৃতি পায়, তাহলে সেটা সম্ভব হবে শুধুমাত্র ফর্মের কাব্যিক রেখারূপের জন্য, যা ধ্রুব—যা কোন দিনই কোন ধারণা স্পষ্ট পরিস্ফুটনের প্রয়াসে স্পষ্ট নয়। আসলে যখনই তিনি চিত্রকল্পের কথা চিন্তা করেছেন, তখনই বর্তমানকে আলোকিত পাদপ্রদীপের সামনে আনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, অথবা অতীতের ধ্যানে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন তিনি ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে যে সীমানাচিহ্ন ভাবতে আমরা অভ্যস্ত তা কিন্তু অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং অনায়াসে প্রবেশ করে এক অন্তহীন সৃষ্টিময়তার জগতে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় একাধারে উপস্থিত থাকে মানবমন, তার হৃদয় আর আত্মার মননের এক অসামান্য সমন্বয়সাধনের ইঙ্গিত।

যদি রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়ে সেখানে পৌছান বোধহয় সম্ভব হবে না। তাঁর চিত্রকলা একটি সামগ্রিক প্রয়াস, সমগ্রের সঙ্গে একাত্ম না হলে সেই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রেরণা, বোধি আর খণ্ডিতবোধ যখন সাবলীল ক্রীড়া করে সৃষ্টিপ্রয়াস তখনই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে থাকে। সৃষ্টি তখন রূপ পায় নানান ফর্মের মধ্যে, যে স্থানে অবচেতনভাবে চিত্রাঙ্কনের যাত্রা, সেস্থান সম্পর্কে তখন সে করেনা কোনো অভিযোগ, কারণ তখন তার বৈশিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংযুতি-সঙ্কেতের সহাবস্থানে স্বীকৃত হয়। সেইভাবে চোখকে টেনে নেয় সেই চিত্রকলা, রেখা ছন্দ আর ফর্মের সৌন্দর্যসুষমার রস সে আস্বাদন করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন ভিন্নমুখী অভিজ্ঞতাকেও করামলকীবৎ স্বাভাবিক করে তুলতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল এবং তা সব থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি উপহার দিতেই যেন তৎপরতা তাঁর। তাঁর দর্শক সাধারণও সে সবের রসাস্বাদন করে তৃপ্ত হতে পারেন। কারণ তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে এক অমোঘ ইঙ্গিত, যে ইঙ্গিতে মানুষের মধ্যে সুপ্ত অমল স্বর্গীয়তা নিমেষে জাগ্রত হতে পারে। চিত্র-শিল্পের অঙ্কন পদ্ধতির মাধ্যম হিসেবে তিনি কোনো জিনিষ ব্যবহারের বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। যে কোনো কাগজই ছিল ভাল তাঁর কাছে। এমনকি প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত ব্রাউন কাগজও তাঁর নজর কাড়ত। পেনসিল, ক্রেয়ন, জলরঙ, কালি-কলম, কিংবা তেলরঙ সবই তিনি ব্যবহার করতেন। কখনও তিনি চিত্র পরিবেশ তৈরির আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত ক্যানভাসে জলরঙ উপুর করে ঢেলে দিয়েছেন, তারপর সেই অবস্থাকেই ক্রমে কল্পনার ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর পছন্দ ছিল জলরঙের সঙ্গে কালি-কলমের নাটকীয়তা। কখনও, জলরঙে চোবানো ক্যানভাসের ওপরে নিষ্ঠুরভাবে পেনের নিব দিয়ে আক্রমণ চালাতেন, বলা বাহুল্য সেই দ্রুত, কর্কশ অথচ গতিময় ব্যবহারে বেশিরভাগ সময়েই নিব ভেঙে যেত। চিত্রাঙ্কনের কৌশল ও দক্ষতা যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। অবশ্য কাঙ্ক্ষিত ছবির প্রয়োজনে আর তার মানসিক চিন্তাধারার সমমর্মী মাধ্যম ও কৌশল তিনি তৈরি করতে জানতেন, যা অহরহ বদলে যেতেও পারত, এমন কি আঁকিবুকির ব্যাপারেও। আর এইসব আঁকিবুকি যা তিনি অহরহ তাঁর পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সময় করেছেন, সেগুলিই কাগজের ওপরে ফুটিয়ে তুলেছে অকল্পনীয় সব চিত্ররূপ। চিত্রাঙ্কনের সময়ে কাগজ ছিঁড়ে যাওয়া, নিব ভেঙে যাওয়া বা এই ধরণের ছোটখাটো দুর্ঘটনা কখনই তাঁর মানসিক স্থৈর্যকে টলাতে পারেনি, কর্মবিমুখ করতে সক্ষম হয়নি কোনদিনই।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুদেবের ছিল না কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। তা থাকলে সেইসব হয়ত তার চিন্তাধারার স্বকীয়তাকে কিংবা অঙ্কন কৌশলকে সীমায়িত করতে পারত। আসলে তাহলে তাঁর মন হয়ত একটি বিশেষ কোন ভাবে ভাবিত হয়ে যেত। আর বিশেষভাবে ভাবিত একপেশে কোনো মন কখনও সত্যিকারের সৃষ্টি করতে পারে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুক্ত মন থাকার জন্যই তিনি এমন সব চিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা দর্শককে চুম্বকের মতন টেনে রাখে, তাঁর চিত্রধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়, শুধু অতীতের নয়

বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনা ছাড়াও সর্ব অস্তিত্বময়তার মধ্যে বাধ্য করে দর্শককে টেনে রাখতে।

বিষয়টাকে সঙ্গাভিলাষী বিস্ময়ের একটি ঘূর্ণিঝড় বলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: "পোরট্রেট অ্যাট লাহোর" (ওয়াটার কলার—ক্যাটলগ ৭); "মাস্ক" (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৩৫); "পোরট্রেট কাদম্বরী দেবী" (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৩); "ল্যাণ্ডস্কেপ" (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৮)—এইসব ছবি শুধু পটে আঁকা ছবিমাত্র নয়—ছবিগুলি দর্শকের মধ্যে অভিসঞ্চালিত দৃষ্টির দিগন্ত উন্মোচিত ক'রে তাঁকে দূরে নানাস্থানে নানানদিকে টেনে নিয়ে যায়, তাঁর মনকে অতীত আর ভবিষ্যতের পরিবেশে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। এইসব ছবির সময় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে আমাদের, প্রসারিত করে দেয় আমার দৃষ্টিদানের শক্তিকে। যেন সেগুলি নিজেরাই শক্তির রূপ। তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে নিহিত শক্তির সঞ্চয় সমস্ত বিশ্বকে কাছে নিয়ে আসে, কিন্তু সেই বিশ্ব রূপান্তরিত হয় নতুন এক বিচিত্র বিশ্ব—যে বিশ্ব শান্তির ধ্বনিতে ধ্বনিময়, প্রত্যেকটি মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে শান্তি উৎসারিত হয়েছিল, অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিল আধ্যাত্মিকতায়, তৃপ্তি ও সন্তোষের মধ্যে যে 'বিশ্বমানব'-এর অনুভব—সেই বিশ্বজনীন মানুষ—গুরুদেব নিসন্দেহে নিজেই ছিলেন তাই।

১৯২২ সালে কলকাতায় জর্মান এক্সপ্রেসিওনিজম এর বাউহাস (Bauhaus) ছবির প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময়ে বাউহাসদের মধ্যে ওয়াসিলি কানডিন্স্কি, পল এলেক, কিরচেনার এবং আরও কয়েকজন দিকপাল শিল্পী ছিলেন। ১৯১০ সালে শুরু হয়ে জর্মান এক্সপ্রেসিনিওজম ১৯২০ সালেই সমাপ্ত হয়েছিল, সেই আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই তুঙ্গে উঠেছিল। একটি বিশেষ সময়ে, যখন বেশ অনেকগুলি ছবিই আঁকা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে জর্মান এক্সপ্রেশসিওনিজমবিদদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত নিরলস কাজের মাধ্যমে তাঁর ছবির মধ্যে তিনি আনতে পেরেছিলেন চারিত্রিক এক রহস্য। ফলে তার ছবিগুলি দর্শককে তাড়া করে ফেরে, তার স্বকীয়তা এত প্রবল যে তার সব ছবিই কাব্যময় হয়ে ওঠে, মূলত যা ভারতীয়। এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ পেয়েছেন দিব্য আধ্যাত্মিকতার (theosophy), এমন কি তিনি অন্ধ্র প্রদেশের মদনপল্লীতেও চলে গিয়েছিলেন, যে স্থান হচ্ছে ওয়ার্ল্ড থিওজফিক্যাল

সোসাইটির প্রধান কার্যালয়। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্র ছাড়াও এই সূত্রে তিনি ওয়াসিলি কাণ্ডিনস্কির নিকট সংস্পর্শে আসেন, তাঁর জর্মানির যাত্রাপথে। কাণ্ডিনস্কি ছিলেন থিওজফির প্রতিষ্ঠাত্রী রাশিয়ার ম্যাডাম ব্লাভাৎস্কির গুণগ্রাহী। কাণ্ডিনস্কি নিজে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন থিওজফিস্টদের রচনাবলীর সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন করে। তাঁর বক্তব্য ছিল—"শিল্পের সঙ্গে নানাভাবে ধর্মের সাদৃশ্য বর্তমান,...আমি সেই মতেই বিশ্বাস করি, সে মত প্রচার করে যে প্রতি-অস্তিত্বের মধ্যে সব কিছুরই অঙ্কুর রয়েছে।" একইরকমভাবে গুরুদেব জর্মানির অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন যাদের মধ্যে পল ক্লি, অ্যালেক্স জওনালস্কি, ফ্রানজ মারো, ম্যাক্স কোকাশ্কিন, আর্নস্ট লাউউইগ কিরচেনার এবং আরও অনেকেই। কিন্তু যে বিষয়টি সত্যি সত্যিই আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হল—বিদেশের অসংখ্য শিল্পকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েও কিভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বকীয়তা অক্ষুন্ন থাকতে পেরেছিল, যে স্বকীয়তায় তাঁর সব শিল্পকর্মেই বিশেষভাবে ভারতীয় পরিবেশ বজায় থাকে। ভারতীয় মেজাজ শুধু মাত্র ফর্ম বা কনটেণ্টের মধ্যেই নয় এমন রঙ ব্যবহার এবং টোনাল-এর কোটের মধ্যেও। সম্ভবত একাজ হয়েছিল কারণ তাঁর সৃষ্টি কেবলমাত্র বোধিনির্ভর ছিল না, ছিল আরও গভীরতর প্রদেশের আহ্বান থেকে। ঠিক সে স্থান থেকেই তাঁর শিল্পসত্তার সত্য উৎসারিত।

এই বিশেষ বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের ভাবিত করা উচিত। যথার্থই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে—"শুধুমাত্র বোধি থেকে সৃষ্ট শিল্প মহৎ হয়ে উঠতে পারে না। মহৎ শিল্পে উৎসারিত হয় অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে। শিল্প বোধিনির্ভর হতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার রূপটি সম্পূর্ণ অন্যরকম।" একজন অনন্য সৃষ্টিশীল শিল্পী কখনই সময়ের বাঁধনে বাঁধা থাকে না, বাঁধা থাকে না তার গণ্ডীর মধ্যে—তাঁর আত্মা সবসময়েই অনুসন্ধানের তীব্রতায় থাকে টান টান, সে জানে না কোথায় পাবে তারে। তাই সৃষ্টির বাতাবরন সূর্য বা প্রদীপালোক-বিচ্ছুরণের মতন চিরটাকালই থাকে ধ্রুব। আর সত্যের ছন্দ, গুরুদেব তাঁর শিল্পকলার মধ্যে যা ক্রমাগত বিধৃত করেছেন, আবহমান প্রেরণা জুগিয়ে আসছে অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে, আলোকের সন্ধান দিয়েছে তাঁদের, খুঁজতে সাহায্য করেছে সুন্দরকে।

"কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামি
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি"—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা এ্যাকাডেমিতে। সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিগুলি নির্বাচিত হয়েছিল। অনেক ছবিই এর আগে দেখা যায় নি। ভারতবিখ্যাত শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক জে. হুলতান আলী একমাত্র বিভাবের জন্যই বিশেষ এই রচনাটি প্রদর্শনীটি দেখে লিখেছেন। তাঁর ইংরাজী মূল রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন মুকুল গুহ—সম্পাদক।]

শিল্পভাবনা

গান্ধী

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

অ্যাটেনবরোর গান্ধী দেখে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা চটছে, আমেরিকার লোকেরা কাঁদছে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে যেখানে গান্ধী দেখানো হচ্ছে, হলে তিলধারণের ঠাঁই থাকছে না, এর চাইতে সুখবর আর কী হতে পারে। চল্লিশবছর ধরে ভারতের বিদেশ দফ্‌তরগুলো যা করতে পারে নি, এক গান্ধী ফিল্ম সেটা সম্পন্ন করেছে, ভারত সম্পর্কে বিদেশের লোকেদের কিছু ধারণা হচ্ছে। ভারত সরকারের এই ফিল্মে অর্থ লগ্নী করা সফল হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফিল্মটিতে ইতিহাসের ব্যত্যয়, রাজনীতির বিকৃতি, গান্ধী চরিত্রের অপলাপ হয়েছে কি হয় নি, সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা, ভারত সম্পর্কে বিদেশের কৌতূহল হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও যে গান্ধীকে আমরা ভুলে যেতে বসেছিলাম সেই গান্ধীকে আবার স্মরণ করছি। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গান্ধী প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবেও জড়িত ছিলেন না এবং এই হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধী কোনো ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ফিল্মটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ব্রিটিশ শাসনের নৃশংসতা, অমানবিকতা, এবং অবিমৃষ্যকারিতা এই ঘটনার মাধ্যমে যেভাবে ফিল্মে রূপ পেয়েছে, তারপর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক শক্তি আর থাকে নি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ এই চিত্রাংশে নিষ্ঠুরভাবে ফুটে উঠেছে।

ইতিহাস অনুযায়ী কিন্তু অ্যাটেনবরো সত্য প্রচার করেন নি। দেখানো হচ্ছে হত্যাকাণ্ডের পর স্তম্ভিত নেহরু এবং গান্ধী কুয়োর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগ যান নি। রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ডরুজকে পাঠিয়ে ছিলেন গান্ধীর কাছে বোম্বাইতে। অ্যাণ্ডরুজকে গান্ধী বলেছিলেন, এখন পাঞ্জাব যাওয়া যাবে না, পাঞ্জাবে ঢুকতে গেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পাবে, অহিংসার পথ আরো সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠবে। ইতিহাস অনুযায়ী তাহলে কুয়োর সামনে গান্ধী অসত্য। কিন্তু এই অসত্যতায় কি কিছু যায় আসে? জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা গান্ধীকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল, কিন্তু অহিংসার পথ থেকে তাঁকে টলাতে পারে নি। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টও বিমূঢ় এবং লজ্জিত, কিন্তু এই বিমূঢ়তা বা লজ্জা ইংল্যাণ্ডের শাসকদের পরবর্তী নৃশংসতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এই অহিংসা আর হিংসার সংঘর্ষই অ্যাটেনবরো বেছে নিয়েছেন। ফিল্মের ভাষায় এই সংঘর্ষ তুলে ধরার জন্য গান্ধীকে ওই সময় পাঞ্জাবে আনা সমর্থন না করে উপায় নেই, নাহলে আবেগ সংহত করা যায় না।

সমস্ত দেশ গান্ধীর পিছনে, শহীদদের আত্মত্যাগের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হচ্ছে, শহীদদের বীরত্বের শ্লাঘাও তিনি নিচ্ছেন, চল্লিশ কোটি লোক তাঁর কথায় আন্দোলনে অগ্রসর হচ্ছে আবার বিরতি নিচ্ছে, কিন্তু গান্ধী তাঁর পথে অবিচল সর্দার প্যাটেল যখন তাঁকে জানাচ্ছেন, দেশ এগিয়ে চলেছে, গান্ধীর অবিচল উত্তর, কোন্ দিকে। তাঁর লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা নয়, তাঁর লক্ষ্য অহিংসার পথে শুদ্ধি।

এই গান্ধীকে আমরা মানতেও পারি, নাও মানতে পারি। কিন্তু এটা মানতে হবে গান্ধী নিজের একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই পথেই তিনি চলেছিলেন। অ্যাটেনবরো সেই পথটিই তাঁর ছবিতে এনেছেন, এবং যত মোটা দাগেই হোক, সেখানে তিনি সফল। সেই অহিংসার ব্রততে নেহরু প্যাটেল জিন্না একেবারেই অবান্তর, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা যতই শক্তিমান হয়ে থাকুন, ছবিতে তাঁদের এবং সেই ক্ষেত্রগুলোর আনার প্রশ্ন উঠে না। এই ছবি ভারতীয় রাজনীতির ছবি নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও নয়, এই ছবির বিষয় বুর্জোয়া শক্তির ভক্ত গান্ধী নন, কূট রাজনীতির চালে অভিজ্ঞ গান্ধী নন, রামরাজ্য ভক্ত অবৈজ্ঞানিক সংস্কারাচ্ছন্ন গান্ধী নন, এই ছবি অহিংসার পথিক গান্ধীর। এবং আমরা যতই চেঁচামেচি করি না কেন, শেষ বিচারে, গান্ধীকে

জিজ্ঞাসা করলে আমাদের প্রথমেই যে ছবি মনে আসে সেটা লাঠির ঘায়ে পড়ে যাওয়া গান্ধীরই। দক্ষিণ আফ্রিকার পড়ে যাওয়া গান্ধী দিয়ে অ্যাটেনবরোর ছবি শুরু, নাথুরাম গডসের গুলি খেয়ে গান্ধীর পড়ে যাওয়া দিয়ে শেষ, এই সত্যাগ্রহী গান্ধীই ছবিটির বিষয়।

যে সমস্ত অনৈতিহাসিকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তথ্যের বিচারে সেসব অনৈতিহাসিক ঠিকই, কিন্তু তাতে কী যায় আসে? সুরাবর্দীর ঘটনা দেখানো হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে? গান্ধীকে নেহরু এবং অন্যান্যরা জানাচ্ছেন, হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি থেমে গেছে। গান্ধীর প্রশ্ন, এখনকার মত থেমেছে হয়ত, কিন্তু একেবারেই কি? আমরা জানি ইতিহাস দিয়েই, থামে নি। সুতরাং স্বাধীনতার আগে ঘটনাটা দেখানো হলো কি পরে হলো, তা দিয়ে গান্ধীর চেষ্টা বা তার সাফল্য অসাফল্য কিছুই আসে যায় না।

প্রশ্ন ওঠে, সুভাষ বসু নেই কেন, সহজ উত্তর, থাকার কোন কারণ নেই। যে পর্যায়ে কংগ্রেস বা ভারতের ইতিহাসে সুভাষ বসু গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৩৮—৪৫, সেই পর্যায়ের ইতিহাস এই ছবিতে আদৌ নেই। অ্যাটেনবরো বেছে নিয়েছেন গান্ধীর সেই সব অধ্যায়গুলো যেখানে তাঁর সত্যাগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ, অসহযোগ, চৌরিচৌরা, ডাণ্ডী তাঁর ভারত ভ্রমণ এসেছে সেই অসহযোগের বাতাবরণ হিসেবে, যাদের নিয়ে তাঁর সত্যাগ্রহের পরীক্ষা। জালিয়ানওয়ালারাগ এসেছে যাদের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যাগ্রহ তাদের ছবি দেখাতে।

রবীন্দ্রনাথ এই ছবিতে নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ বিরোধী। অসহযোগের পূর্ণ রাজনৈতিক পরিচয় দিতে হলে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক হতো, অসহযোগের বিরোধিতার কারণ উদ্‌ঘাটন করার জন্য। কিন্তু পূর্ণ গান্ধী-জীবনে অসহযোগ একটি অধ্যায় মাত্র, অসহযোগের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে হলে ছবিটির লক্ষভ্রষ্টতা ঘটত। তেমনই নেই আম্বেদকর। ছবিটিতে গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনও খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। দিতে গেলে আবার লক্ষ্যভ্রষ্টতা হতো। অ্যাটেনবরোর বিষয় তর্কসাপেক্ষ গান্ধী নয়। এমন কি প্রশ্নবিদ্ধ গান্ধীও নয়। ছবিতে এমন কোনো দৃশ্য নেই যেখানে গান্ধী নিজেকে প্রশ্ন করছেন, নিজের পথ নিয়ে সন্দেহ করছেন, আত্মসমালোচনা করছেন। গান্ধী নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর অসংখ্য সংশয়, ভ্রান্তি, সত্যের অপলাপ নিয়ে আক্ষেপ

করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, অ্যাটেনবরো কুড়ি বছর পড়াশুনা করেও, এই সব বিষয়ে ক্যামেরা ঘোরান নি। প্যাটেল গান্ধীকে কংগ্রেসে এনেছিলেন কি না, নেহরু গান্ধীকে মহাত্মা নামে ভূষিত করেছিলেন কি না, এসব প্রশ্ন তুচ্ছ, যেটা আরো গূঢ় প্রশ্ন, ব্যক্তি গান্ধীকে অ্যাটেনবরো দূরে রাখলেন কেন, কেন গান্ধীকে মনে হয় অবিচল, একমুখী, সর্বংসহ, সর্বজ্ঞানী। এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, যারা গান্ধীর ভক্ত বা গান্ধীবিরোধী, এই ছবিতে নতুন করে কোনো ধাক্কা পাবে না, কিন্তু যাদের কাছে গান্ধী এক অজানা ব্যক্তি, তাদের কাছে গান্ধী ফিল্ম একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ফিল্মের ভাষায়ও ছবিটি খুব একটা আহা-মরি না। যে দৃশ্যে গান্ধীকে দেখানো হচ্ছে পিছন থেকে, সেই বসে থাকা গান্ধীর চওড়া পিঠ চোখে ধাক্কা মারে, পেশীবহুল গান্ধী উৎকট লাগে। গান্ধীর যে হাঁটু-মুড়ে বসে থাকার পরিচিত ভঙ্গী, সেই ভঙ্গীটি আনতে কিংসলেকে স্পষ্টতঃই দেখা যায় বেশ কসরত করতে। ডাণ্ডী অভিযানের সময় পদযাত্রায় গান্ধীকে মনে হয় যেন বাংলা যাত্রা দেখছি। ভারত দর্শনের সময় গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে গায়ের কাপড় খুলে তা দিয়ে দিতে দুঃস্থা রমণীকে, সেই দৃশ্যটি খুবই সাজানো-গোছানো, সেখানে নদীর জলও ডিরেক্টরের কথা শোনে। ঠিকঠিক গায়ের কাপড়টি পৌঁছে দেয় যথাস্থানে। কিন্তু এসব তুচ্ছ। সবরকম আতিশয্য, বিকৃতি, কৃত্রিমতা থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ফিল্মটি তরতর গতিতে এগিয়ে চলে, তার একমাত্র কারণ, গান্ধী পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অসাধারণ চরিত্র এবং সেই অসাধারণ চরিত্রের মূল ছবিটি, যত মোটা দাগেই হোক, অ্যাটেনবরোর ক্যামেরায় ফুটে উঠেছে। এবং সেই ছবি হলো কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী, কঠিন পরীক্ষায় রত, গান্ধী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভবিষ্যতের জ্বালানি

অভী সেনগুপ্ত

প্রকৃতির সন্তানেরা নয় এবার খোদ প্রকৃতিই তার অভাবের কথা, সীমায়িত ভাঁড়ারের কথা আগাম আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। আনুমানিক ষাট কোটি বছর ধ'রে পেট্রোলিয়ামকে যে-হারে তিলতিল ক'রে সঞ্চয় করা হয়েছে মানুষ, প্রকৃতির অমিতব্যয়ী সন্তানটি, তুলনায় বহুগুণ দ্রুতহারে সেটি খরচ করতে শুরু ক'রে ভাণ্ডারটিকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে। অথচ সভ্যতার প্রায় সমুদয় ভিতই এখন কাঁধে তুলে নিয়েছে 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন' নামক সেই ঢাকনা-খোলা কলসির মধ্য থেকে বের হওয়া ভূতটি, যে সভ্যতার জন্য কি না এনে দিতে পারে! আর কে না জানে তার খোরাক বলতে অনেকটাই বোঝায় তরল জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম কিম্বা সমগোত্রীয়রা। একই সঙ্গে সভ্যতার এটা-সেটার প্রয়োজন মেটায় যে কয়লা কিম্বা বনজসম্পদ, তাকেও আমরা যথেচ্ছ খরচা করেছি কিন্তু মনে রাখিনি যে সেটা এমন কিছু মধুদাদার হাত থেকে পাওয়া দৈ-এর ভাঁড় নয়। ফলতঃ এই দিক থেকেও আমাদের জন্য একটি শুষ্ক, নৈরাশ্য-জনক ছবি এগিয়ে আসছে। সুতরাং পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো, এটা মনে রেখেই বিশেষতঃ তরল জ্বালানির বিকল্প একটা কিছু আবিষ্কারের জন্য মানুষকে আসমুদ্রহিমাচল খুঁজে দেখতে হচ্ছে।

শক্তির উৎসের নতুন ভাণ্ডারগুলি গ'ড়ে তোলার জন্য প্রকৃতির নানা যাদু-দণ্ডকে কীভাবে তুষ্ট ক'রে কাজে লাগানো যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছে। চীন তার নদীনালাতে উল্লেখযোগ্য 'মিনি' জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বাঁধ বেশ কিছু

বেঁধেছে। কাছাকাছি প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশেও কাজ হচ্ছে। এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর নাম করা যায় যেখানে ৭০-৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঐ সব বাঁধ থেকে উঠে আসছে। মজার কথা হচ্ছে অল্পবিস্তর অসুবিধা থাকলেও জল-বিদ্যুতের স্বর্নসম্ভাবনা রয়েছে ব্রহ্মপুত্রকে নির্ভর ক'রে, অথচ কীসের জন্য করা? জলবিদ্যুতের প্রয়োজন রয়েছে এমন শিল্পাঞ্চল ব্রহ্মপুত্র থেকে বহু দূরে এবং পদার্থ বিজ্ঞান মারফৎ আমাদের শিক্ষা এই যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলবিদ্যুৎ শক্তির ক্ষমতাও একরকম সমহারেই নেমে যেতে থাকে।

সূর্যালোক থেকে জ্বালানির উৎস সন্ধানে নানা চেষ্টা চরিত্র করা হচ্ছে। সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যাকে আপাতত 'সোলার ফোটোভোল্টেরিক মডুল' নামে ডাকা হচ্ছে সেটি কোনও ছোট গ্রাম কিম্বা অন্যত্র বড় জোর চল্লিশ/পঞ্চাশজনের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, কিন্তু শিল্পাঞ্চলের ময়দানবীয় ক্ষুধা মেটানো থেকে ঐ পদ্ধতি এখন মেরু প্রমাণ দূরত্ব দিয়ে হাঁটছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথাগত বিকল্পগুলির তুলনায় নতুন ও পুনঃব্যবহার্য জ্বালানিটি প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রতিপালন করার ব্যয়ভার যথেষ্ট বেশী। যেমন আমরা জানি যে অনেক কলকারখানাতেই বয়লারের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা গেছে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের জলকে আনুমানিক ৭০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপগুণবিশিষ্ট ক'রে দিলে বয়লারটির উৎপাদনের কাজ নানা কারণে সুবিধাজনক হয়। যদি সূর্যালোককে ঐ তাপগুণবিশিষ্ট করানোর কাজে লাগানো যায় তবে যে উদ্ভাবনযন্ত্রটির প্রয়োজন হবে তার ক্রয়মূল্য হবে প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা আর যন্ত্রটিতে বার্ষিক অর্থকরী সুবিধা হবে ক্রয়মূল্যের মাত্র ১·৬ শতাংশ অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে ফিরে যেতে আমাদের প্রায় ষাট বছর অপেক্ষা করতে হবে। যন্ত্রটি ততদিনে স্বাভাবিক ক্ষয় ও ক্ষতির হাতে প'ড়ে প্রায় ষোলো আনা অস্বাভাবিক ব্যবহার শুরু ক'রে দিতে পারে।

ইতিহাসের অগ্রগতি আমাদের বিস্ময়বোধকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে অথচ এরই পাশাপাশি আমাদের জন্য, সেই কবেকার রূপকথার যুগ থেকে আজ অবধি, থেকে গেছে সমুদ্রের/ মহাসমুদ্রের রহস্যের ঠিকঠিক সম্পদগুলি। মানুষের প্রয়োজনে, নিদ্রামগ্ন সমুদ্রসম্পদগুলিকে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন জাগিয়ে তুলতে, যাতে প্রয়োজনীয় অভাবহরণ দিনটি দ্রুত এগিয়ে আসে। সমুদ্রের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে এমন দেশগুলি যেমন জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা ইত্যাদি এবং রাশিয়ার মতন উন্নত দেশ এখন সমুদ্রবিজ্ঞানেও বহুদূর

এগিয়ে রয়েছে। ভারতও তার সাধ্যমতন এই দিকে দৃষ্টি রেখেছে। 'কুমেরু অভিযান' তার প্রমাণ। গবেষকেরা নিশ্চিত যে সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে নতুন জ্বালানির নানা অজানা ভাণ্ডার যেগুলি খুঁজে নিতে পারলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাজে লাগানো যেতে পারে।

এইবার সেই জায়গায় ফিরে আসা যাক যেখানে আমরা তরল জ্বালানির বিকল্প-সম্পর্কীয় আলোচনাটিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমরা এই খুঁজে-পাওয়া বিকল্পটির টুঁপিতে নানা সম্মানসূচক পালক গুঁজে দিতে পারি। পৃথিবী-ব্যাপী সমস্ত অনুসন্ধানকে ছেঁকে-নেবার পর দেখা গেছে যে তরল জ্বালানির একমাত্র বিকল্প হচ্ছে মিথাইল অথবা ইথাইল এ্যালকোহল। এখন পেট্রোল কিম্বা গ্যাসোলিনের সঙ্গে এ্যালকোহলের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এর এটা ভালো তো ওর ওটা ভালো। অন্তর্দহন ইঞ্জিনকে যদি উভয়ের মৃগয়াভূমি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তবে এ্যালকোহলের সংগ্রহে এসে যাবে ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখার মতন একটি দুর্লভ পুরস্কার কারণ এ্যালকোহলের বাষ্পী-ভবনের লীন তাপ বেশি, সে কারণে ইনডাকশনের সময় কম উত্তাপেই খুশি থাকে আর গ্যাসোলিনের থেকে তার আয়তনিক পরিসর ক্ষেত্রও বৃহত্তর। এছাড়া তৈল জ্বালানির তুলনায় এ্যালকোহল, উচ্চ কম্প্রেসন ক্রিয়া প্রণালীটি নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়। অন্যদিকে তৈল জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোল কিম্বা গ্যাসোলিনের ক্ষমতা ও দক্ষতার সামনে এ্যালকোহলকে মুখ লুকোতে হবে যখন ইঞ্জিনকে স্টার্ট নেওয়া নিয়ে বিচারটা শুরু হবে। এই কারণে যে, এ্যালকোহলের বাষ্পীভবন ধীরগতিসম্পন্ন। এ্যালকোহলের উপস্থিতিতে ইঞ্জিনের স্টার্ট নেওয়া বেশ কিছুবার ঢোঁক গিলতে থাকবে। নানা কারণে বর্তমানে ব্যবহৃত স্পার্ক পদ্ধতির ইঞ্জিনে এ্যালকোহলের ব্যবহার সুবিধাজনক নয়।

এ্যালকোহল ও তৈলজ্বালানির দোষগুলিকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়ে, শুধু গুনগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি মেধাসম্পন্ন সংকর জ্বালানি গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবেই আবিষ্কৃত হলো গ্যাসোহল যা কিনা এ্যালকোহল ও গ্যাসোলিনের যথাক্রমে ৭০ : ৩০ অনুপাতের মিশ্রণ। ইথাইল এ্যালকোহলের আনবিক গঠনের সঙ্গে পেট্রোলের আনবিক গঠনপ্রকৃতির ভেদাভেদ নামমাত্র, শুধু, এ্যালকোহলের অণুতে রয়েছে একটি অক্সিজেন পরমাণু। গ্যাসোলিনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এই পরমাণু একটি 'নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডল থেকে জল শুষে নেয়, এভাবেই গ্যাসোলিন ও এ্যালকোহল দুটি ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে

যায়। এককভাবে ব্যবহৃত হলে উপাদান দুটির যে প্রধান দোষগুলি থেকে যায় গ্যাসোহল তাদেরকে যে শুধু বনবাসেই পাঠিয়েছে তাই নয়, উপাদান দুটির চূড়ান্ত সুবিধাগুলিও আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছে। গ্যাসোহলকে অন্তর্দহন ইঞ্জিনে ব্যবহার করলে নানা সুবিধার মধ্যে এগুলিও পাওয়া যায়—

ক) উচ্চমানের কম্প্রেশন অনুপাত খ) সহজে স্টার্ট নেয় গ) উচ্চমানের তাপ-দক্ষতা, ফলে—অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয় ঘ) কম আবহদূষণ।

এভাবেই গ্যাসোহলের আবির্ভাবে পেট্রোল কিম্বা গ্যাসোলিনের বিষাদময়, রিক্ততার ছবিটি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ্যালকোহলের উৎস সন্ধানে আমাদের দিগন্ত অবধি ধাওয়া করতে হবে না। 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' এগোলেই আমরা নানাসূত্রে একে পেয়ে যাবো যেমন আখের রস কিম্বা গুড়, আলু, নানাপ্রকার রসালো ফল, কৃষি ও পুর আবর্জনা। ব্রাজিল তার প্রাকৃতিক সম্পদকে গ্যাসোহল প্রস্তুতিকে আর কেবল পরীক্ষার স্তরে নয় একেবারে জীবনের দৈনন্দিনতার পর্যায়ে এনে দিয়েছে। ব্রাজিল আস্থা রাখে যে ১৯৮২ সালেই এই বিকল্প জ্বালানিটির মাধ্যমে সে প্রথাগত জ্বালানির ২০ শতাংশকে শিকেয় তুলে রাখবে আর ১৯৮৬ নাগাদ ঐ দেশে, অন্তর্দহন ইঞ্জিনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে, গ্যাসোলিন কিম্বা পেট্রোলকে একক-হিসেবে সম্পূর্ণভাবেই পাততাড়ি গুটোতে হবে।

ব্রাজিল সরকারের এই পরিণামদর্শী প্রকল্পটিকে অন্যান্য দেশও দ্রুত অনুসরণ করতে চাইছে, দুই বিশ্ব তো বটেই এমনকি তৃতীয় বিশ্বের নানাদেশ যেমন ভারতও এই বিষয়ে এখন পুরোপুরি আগ্রহান্বিত। ভারত সরকারের একটি নূতন মন্থণালয়ের জন্ম হয়েছে যার নাম—জ্বালানির অতিরিক্ত উৎস। এই মন্থণালয়ের অধীনে আছে কয়েক বছরের প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় একটি সংস্থা Commission for Additional Sources of Energy (CASE) এ্যালকোহলের সহজপ্রাপ্যতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়, যেহেতু এই পণ্যের নানারকম সমস্যার পিছুটান রয়েছে যেমন দেশের সর্বত্র এর বণ্টনসমস্যা, উৎপাদনের উচ্চ ব্যয় এবং পণ্যটির ওপর নানারকমের করভার। আমাদের দেশে এ্যালকোহল উৎপাদনের বিবিধ উপাদান অজস্র সূত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র রাসায়নিক কারখানা, কাগজের কল ইত্যাদির থেকে উদ্ভূত আবর্জনা এবং কৃষি-আবর্জনা থেকে, বাৎসরিক এ্যালকোহল উৎপাদন, মাটির থেকে কিছুটা উঁচুতে যেন শূন্য দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছে—এমন দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

সাহিত্য সংসদের বই

বঙ্কিম রচনাবলী
১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [৩০.০০]
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ [যন্ত্রস্থ]

মধুসূদন রচনাবলী
এক খণ্ডে ইংরেজিসহ সমগ্ররচনা [৩২.০০]

রমেশ রচনাবলী
এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (৬টি) [২৫.০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী
এক খণ্ডে সমগ্র রচনা [২৫.০০]

গিরিশ রচনাবলী
পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা
[প্রতি খণ্ড ২৫.০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ
তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প
[প্রতি খণ্ড ৪০.০০]

সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ
এক খণ্ডে সমগ্র কাব্য-অংশ [যন্ত্রস্থ]

বৈষ্ণব পদাবলী
চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ [৭৫.০০]

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান
প্রায় সাড়ে-তিনহাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনী [৪০.০০]

সংযোজন খণ্ড :
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান
সম্প্রতি প্রকাশিত। [১০.০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত [৩০.০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য
ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [২৫.০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন
ডঃ শঙ্কর ঘোষ [২০.০০]

India Wrests Freedom
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত [৭০.০০]

Buddhist Monuments
ডঃ দেবলা মিত্র [২০০.০০]

The Buddha And Five After Centuries
ডঃ সুকুমার দত্ত [৪০.০০]

Indian Drawing
শ্রীফণীভূষণ [৪৫.০০]

সা হি ত্য সং স দ
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

KESORAM INDUSTRIES
&
COTTON MILLS LIMITED

9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA 700 001

★

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron Spun Pipes and Fittings, Cement, Refractories etc.

Sections :	*Mills :*
Textile Section	42, Garden Reach Road, Calcutta.
Rayon G.T.P. Section	Tribeni, Dist. Hooghly.
Spun Pipe Section	Bansberia, Dist. Hooghly.
Cement Section	Basantnagar, Dist. Karimnagar (A.P.
Refractory Section	Kulti, Dist. Burdwan.

ভারতীয়দের ইংরাজীচর্চা ও রাজা রাও

এষা দে

ভারতীয়দের ইংরিজীচর্চার প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনোভাব সাধারণভাবে উদাসীন ও অবজ্ঞার। যদিও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বাঙালী আত্মশ্লাঘার ইন্ধন জুগিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমের পাঠকমহলে '৬০ এর দশকে ডম মরেস বা অধুনা সলমোন রশদি-র (**Midnight's Children** এর রচয়িতা) সাফল্য আমাদের বিশেষ স্পর্শ করে না বরং প্রায়শই শ্লেষাত্মক মন্তব্যর লক্ষ্য হয়ে থাকে। এমন কি আমাদের ঘরের ভিতরের আপনজনেরা, যেমন তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, মনমোহন ঘোষ, সুধীন ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য—সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে ভাসা-ভাসা উৎসাহই জাগায়। বলা বাহুল্য এ দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমি ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এ ছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী ত্যাগ ও বাংলা ভাষায় প্রত্যাবর্তন আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান পথপ্রদর্শক। বাঙালীরা সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে মনে মনে সর্বদা মাইকেলকে সমস্ত ভারতীয় ভাষার লেখকদের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে স্থাপন করে বসে আছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যে কিঞ্চিৎ শ্লেষও অন্তর্নিহিত সেটা আমরা সব সময় উপলব্ধি করি না। মাতৃ-ভাষাতেই একমাত্র সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব আমাদের এ প্রচলিত ধারণাটি মূলত বিদেশী। প্রাচীন বা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃভাষায় রচনার মাহাত্ম্য বিশেষ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের যে বিশাল সম্ভার সর্বভারতীয় এবং জাতীয় পরম্পরায় প্রথিত তা কোন সময়েই আপামর জানসাধারণের মাতৃ-

ভাষায় রচিত হয় নি। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক প্রাচীন সভ্যতার মত এদেশেও জীবনের কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহৃত হ'ত যার সর্বপ্রধান লক্ষণ ছিল লিখিতরূপের আধিপত্য ; রাজকার্য, পূজাঅর্চনা, শাস্ত্র বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর রসিকের জন্য সাহিত্যরচনায় সে ভাষার প্রচার ছিল আবদ্ধ। অর্থাৎ একটি জীবন্ত ভাষার যা সর্বপ্রধান ধর্ম—স্ত্রী-পুরুষ, উত্তম-অধম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যোগাযোগ স্থাপন—ভারতীয় উপমহাদেশের জনজীবনে সংস্কৃত ভাষা কোনদিন সে ভূমিকার অধিকারী ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাই খৃষ্ট জন্মেরও কয়েকশত বছর আগে গৌতম বুদ্ধ জন মানসকে প্রভাবিত করার জন্য বৈদিক অর্থাৎ সংস্কততে তাঁর বাণী প্রচার নিষিদ্ধ করেছিলেন। হয়তো কোন সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীতে ভারতীয় শিশুর মুখে "মাতঃ" উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু যে যুগে সংস্কৃত-সাহিত্য-সৃষ্টি সে সময়ে দেবভাষা শুধুমাত্র একান্তভাবে সংখ্যালঘু পরাক্রমশীলের অধিকারাশ্রিত হয়ে জনসাধারণের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব থেকে ছিল বহু দূরে। প্রাচীন চীনা, গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবি ভাষা ব্যবহারেও বোধহয় অনুরূপ অনেকগুলি বিশেষত্ব পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রাচীন সাহিত্যগুলির নন্দনতত্ত্ব প্রায় পুরোপুরি ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল। যেহেতু এ-সব সাহিত্যের ভাষা শিক্ষা ও প্রচার প্রধানত পুরুষ মারফৎ, তাই জীবনের প্রাণকেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব অনতিক্রম্য। পিতার চেয়ে মাতা শিশুর কাছে বোধহয় সর্বদেশে সর্বকালে নিকটতর। যে ভাষায় মা এবং শিশুর বন্ধন তার অস্তিত্ব জীবনের অন্তঃস্থলে, মাতৃভাষা মানব জীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি। তাই মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এবং বিশেষ করে ব্যক্তি মানুষে কেন্দ্রীভূত হতে চায়। তুলসীদাসের হিন্দী রামচরিতমানস এবং জয়দেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দর মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র সনতারিখের হিসাবে নয়, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার, দুটি পৃথক রসশাস্ত্রের। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন থেকে আধুনিকে এই বিবর্তন স্বাভাবিক এবং বহুক্ষেত্রেই সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত। সংস্কৃত যে মূলত বিদেশী ভাষা এবং ভারতীয় জীবনে দ্বিতীয় ভাষা হয়েও এদেশের মাটিতে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির বাহন হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ সে সময়—যখন সভ্যতার আকার আঙ্গিক ছিল ক্ল্যাসিকাল মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। পরবর্তীযুগে আরবী ফার্সির মত বিদেশী ভাষার পক্ষে এদেশে সমতুল্য কীর্তি অর্জন করা হয়তো সম্ভব হয় নি

তার কারণ তদানীন্তন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি—যখন বিভিন্ন ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনায় ব্রতী। উর্দুর প্রয়োজনভিত্তিক জন্ম ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই হয়েছে।

কিন্তু মাতৃভাষায় সার্থক সৃষ্টির পটভূমি একটি স্থিতিশীল জাতীয় অস্তিত্ব যেখানে ভাষা, সেখানে চিন্তা ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাচীর নেই। যে সমাজে বিবাহ একই গোষ্ঠীর মধ্যে, মাতাপিতাসন্তান এক ভাষাভাষী, মায়ের কাছে শিশু যে ভাষায় প্রথম দাবী জানায় সে ভাষাতেই পরবর্তী জীবনে তার শিক্ষালাভ ও কর্মজীবন। সেই ভাষাতেই সর্বদা প্রকাশ তার রাগঅনুরাগ বিদ্বেষ-বিবাদ ও শ্রদ্ধাভক্তি। অর্থাৎ বাস্তবের সর্বস্তরের সংগে তার যোগাযোগ একটি ভাষায় এবং সেটি তার মাতৃভাষা। ইংরিজী ফরাসী সাহিত্যের আধুনিক কীর্তির যে বিশাল ঐশ্বর্য, তার রহস্য লুকিয়ে আছে কয়েকশত বছরের অবিচ্ছেদ্য একভাষামাত্রিক জীবনযাত্রায়। শেক্সপীয়র জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ সালে এবং যদিও কারো কারো মতে গ্রীক ল্যাটিনে তাঁর দৌড় নেহাৎই সীমাবদ্ধ ছিল, আধুনিক গবেষণায় ক্লাসিক্যাল ভাষায় তাঁর মোটামুটি বুৎপত্তি ছিল বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনা ইংরিজী ভাষাতে বলেই যে কালের বিচারে তার ঔৎকর্ষ নিঃসন্দেহভাবে প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। অতুলনীয় শেক্সপীয়রীয় ইংরিজীর বিকাশে প্রধান অংশীদার তৎকালীন ইংরেজ জীবনে মাতৃভাষার স্বীকৃতির।

শেক্সপীয়রের নাটকের দর্শকেরা আসতেন সর্বশ্রেণী থেকে, স্বয়ং রাজা, অভিজাত পারিষদ থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণরুচি স্বল্পশিক্ষিত নাগরিক পর্যন্ত। পাশ্চাত্য জগতে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃতভাষার বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিদিনের সত্যকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা হয়েছিল, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বহু কারণে অনুরূপ সাহস দেখানো সম্ভব হয় নি বরং শত শত বছর ধরে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা, ধ্যান ও সৃষ্টিধর্মিতার প্রায় এক ধরণের বিচ্ছেদ জিইয়ে রাখাই সমীচিন মনে করে আসা হয়েছে। যে কায়েমী স্বার্থের খাতিরে এই বিচ্ছেদ তার মূল্য দিতে হয়েছে দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানিতে। উত্তরে অনতিক্রম্য হিমালয় এবং দক্ষিণে দুস্তর সমুদ্র—এই দুই সদাজাগ্রত নিষ্ঠাবান প্রহরী থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারিনি তার কারণ —আজ সকলেরই জানা—আমাদের জাতীয় সংহতি বোধের অভাব। এই

অভাবেরই অন্য একটি প্রমাণ জনগণের ভাষাকে সর্বস্তরে গ্রহণ করার অক্ষমতা। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পচন ধরে গিয়েছিল বলেই আমরা ইসলামের মত সজীব ডাণ্ডাধারী ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে ঠেকাতে পারি নি। যে হিন্দু রাজ্যগুলিতে বৃটিশ শাসনেও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, সেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যকীর্তির মান হিন্দু রক্ষণশীল দৃষ্টির অবক্ষয় ও দৈন্যই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টীয় মানবধর্মিতা, জাতীয়তাবাদ ও এক ভাষাকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার যে উর্বর সংমিশ্রণ ইংরেজী-ফরাসী সাহিত্যে প্রাণপ্রাচুর্য জুগিয়ে এসেছে সে তুলনায় ভারতবর্ষে জাতিভেদ-প্রথায় কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য নিজেদের স্বার্থে বহুভাষিক সত্তাকে স্বাভাবিক পরিপূর্ণতালাভে হয়তো বিশেষ সাহায্য করে নি। এই পবিত্র বঙ্গভূমিতেই এক সময় আমাদের আ-মরি বাংলাভাষাতে রামায়ণমহাভারতপুরাণাদি পাঠ ও শ্রবণে নরকস্থ হতে হয় এমন কথা ব্রাহ্মণরা বেশ দাপটেই প্রচার করেছিলেন। এক-ভাষী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দীনতাই আধুনিক ভারতীয় ইংরেজীচর্চার আসল প্রচ্ছদপট রাজনৈতিক পরাধীনতা তার উপলক্ষ্য মাত্র।

বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় উচ্চবর্ণ ভারতীয়ের জন্মগত ব্যুৎপত্তি যেমন স্বাভাবিক, হয়তো প্রায় তেমনি প্রথাসিদ্ধ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনস্রোত থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা। আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যে যাঁরা পরিশীলিত তাঁদের কাছে বাস্তব থেকে মূলচ্ছেদ বিশেষ বাঞ্ছনীয় হয় না কারণ পশ্চিমের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রেরণাই হল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বিদেশী ভাষায় সাহিত্যরচনায় ব্রতী ভারতীয়দের সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে আছে, বিচ্ছিন্নতার আতঙ্ক যার গভীর মর্মস্পর্শীতা আমরা বাংলা সাহিত্যে হয়তো ততটা অনুভব করি না। কারণ মাতৃভাষাকে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করায় পশ্চিমের লেখকদের মত তাঁদের সাহিত্যও অনেকাংশে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাপ্রধান এবং বৃহত্তর মানবতাবোধে নিষিক্ত। হিন্দু ঐতিহ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অচলায়তন ভাঙা আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই সম্ভব এবং আমাদের ইতিহাসে এই বিদ্রোহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমের সাম্রাজ্যলোলুপতাকে ত্যাগ করেছি কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে তার মাতৃভাষাকেন্দ্রিক মানবিক ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণে প্রয়াসী। একই সঙ্গে পশ্চিমকে গ্রহণ ও বর্জন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর জাতিগত ও ব্যক্তিগত সমস্যা। ভারতীয়দের ইংরিজীচর্চাতেই এই জাতীয় সমস্যাটির প্রকাশ সর্বাপেক্ষা, তার কারণ একদিকে

প্রাচীন-পন্থী হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালোপযোগী প্রচণ্ড তাগিদ ও অন্যদিকে বিদেশী পাঠকদের সামনে সনাতন ভারতীয় হিন্দু ভাব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার দুর্মর প্রলোভন একটি বিশেষ যুগের ইংরিজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করে আছে। যেহেতু এই পরস্পরবিরোধীতা আমাদেরই ইতিহাসজাত তাই ভারতীয়দের ইংরিজীচর্চাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার বাঙালী প্রবণতা একটু হয়তো দুঃখজনক। যদিও মাইকেল বিদেশী ভাষার ভিক্ষুকবেশ ত্যাগ করে বংগজননীর কোলে ফিরেছিলেন কিন্তু পরবর্তীযুগে শ্রীঅরবিন্দের মত প্রতিভার পক্ষে সে ঘরে ফেরা যে কেন সম্ভবহয় নি তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বাঙালীদেরই দেওয়া কর্তব্য। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয়ই জানতেন—বাঙালী সাহিত্যপ্রেমিকরা যেমন জানেন – যে ভারতীয়দের দ্বারা রচিত ইংরিজী সাহিত্যের মান হয়তো দ্বিতীয়শ্রেণীর খুব উর্ধ্বে বড় একটা উঠতে পারে না। অবশ্য কোন বেয়াড়া পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র—কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা ইত্যাদি—বিবেচনা করলে একটিও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য কি সর্বাংশে ইংরিজী-ফরাসী সাহিত্যের বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সম্ভারের সঙ্গে তুলনীয়? সে যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য শ্রীঅরবিন্দকে আমরা ইংগবঙ্গ সমাজের নিশ্চিন্ত হালকাহাওয়ায় ভেসে থাকা ফ্যাশনদুরস্ত ইংরিজীনবিশ আখ্যা দিতে পারি না। তাঁর বিদেশীভাষায় আশ্রয় নেবার মূলে আছে আধুনিক ভারতীয়ের দ্বিধাবিভক্ত 'সত্তা যা অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সত্য। এক বদ্ধ সুপ্রাচীন ও চিরন্তন অস্তিত্বের সমকালীনের মুক্ত স্রোতস্বিনীতে মিলিত হওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা।

যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আধুনিক ভারতীয় মানসিকতার সৃষ্টিকেন্দ্র, তারই ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনুভব করা যায় রাজা রাওয়ের জীবন ও সাহিত্যে। বাঙালী পাঠক রাজা রাওয়ের রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন যদিও পশ্চিমে সাহিত্যিক মহলে বিশেষ করে নির্বাসিতদের মধ্যে রাওয়ের খ্যাতি বিস্তৃত। তাঁকে উদ্দেশ্য করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পোল কবি চেশোয়াভ মিউশ লিখেছেন ইংরিজীতে তাঁর একমাত্র কবিতা এবং এটি তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্র। কবিতাটি তর্জমা করে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী লেখেন:

"দেশত্যাগী লেখকের গ্লানি ও আত্মপীড়নে সেই লেখা (অর্থাৎ মিউশের ইংরিজী কবিতাটি) অনেক বেশি মর্মস্পর্শী--আর সেখানেও ব্যঙ্গ আছে ইংরেজনবিশ ভারতীয় লেখক রাজা রাওকে যিনি এমন কি কোন আদর্শের

দ্বন্দ্ব ছাড়াই ভারত ত্যাগ করেছেন—এবং ত্যাগ করেছেন তাঁর মাতৃভাষাকে।" (বিভাব ১৪)

সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ থেকে পশ্চিমে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে আশ্রয় নেবার সময় মিউশ নিজেও যে মাতৃভাষা ত্যাগ করে ইংরিজীতেই লিখেছেন "বন্দী মন" ও আত্মজীবনী "আপন এলাকা" সেটা অবশ্য আমাদের ঐ বাঙালী লেখকের কাছে দোষাই মনে হয় নি। একমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্যই কি জন্মভূমি ও মাতৃভাষা ত্যাগ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত? রাওয়ের প্রতি মিউশের তথাকথিত ব্যঙ্গের মনোভাব এবং ভারতীয় পাঠকের বিদেশী ও স্বদেশী লেখকদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানপ্রয়োগ—এই দুইই আমাদের সামনে একটি জটিল চিত্রের আভাষ দেয়।

রাজা রাও জন্মগ্রহন করেন ১৯০৮ সালে মহীশূরের একটি অতি প্রাচীন অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে, কিংবদন্তীতে যার উত্তরাধিকারের উৎস হয়শালা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কর প্রধানমন্ত্রী ও বিখ্যাত বৈদান্তিক শ্রীবিদ্যারণ্য মাধবাচার্য। রাওয়ের পরিবার বংশানুক্রমিক দর্শনচর্চার অব্যাহত ধারার জন্য মহীশূরের রাজসভায় বরাবর সম্মানিত। ভাগ্যক্রমে রাওয়ের এক পূর্বপুরুষ (পিতামহের ভ্রাতা) এক দেশীয় রাজ্যের রাণীর প্রণয়াসক্ত হন এবং রাজরোষ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পুরো পরিবারকে পালিয়ে আসতে হয় মুসলমান-রাজ হায়দ্রাবাদে নিজামের আশ্রয়ে। অর্থাৎ রাজা রাওয়ের জন্ম নির্বাসনে। তাঁর বিদ্যালাভ ইংরেজ শিক্ষকদের কাছে হায়দ্রাবাদের পাবলিক স্কুলে। এক প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের উত্তরাধিকারী, যার পিতামহ বৈদান্তিক, পিতা কন্নড়ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক—তিনি ছিলেন অভিজাত মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যালয়ে একমাত্র হিন্দু ছাত্র। হয়তো খুব কম ভারতীয় লেখকদের মধ্যে আমরা পারিবারিক ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এমন প্রকট দ্বন্দ্ব দেখি। এই দ্বন্দ্ব, এই বিরোধই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যখন রাজাকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য পাঠানো হয় আলিগড়ে। সে সময় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজী বিভাগের প্রধান ছিলেন অক্সফোর্ডের এরিক ডিকিনসন। ছাত্রদের মধ্যে লুকানো প্রতিভা আবিষ্কারে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। অল্পদিনের মধ্যে রাজারাও (ও আমেদ আলি, Twilight in Delhi প্রভৃতির লেখক) তাঁর নজরে পড়েন। সাহিত্য সম্বন্ধে রাওয়ের রুচি ও মানসিকতা গড়ে তোলায় ডিকিনসনের অবদান অসামান্য। এর অন্যতম ফল ফরাসী সাহিত্যসংস্কৃতিতে রাওয়ের উৎসাহের

উন্মেষ। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৃঢ় আচারবিচারসর্বস্বতা, মননশীলতায় হিন্দু অবক্ষয়ের দীনতা তাঁকে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। অপরদিকে ফরাসী সংস্কৃতির বিশাল ও প্রাণবন্ত পরম্পরা, বিশেষত তার তীব্র বুদ্ধিগত ঔজ্জ্বল্য তাঁকে একেবারে বিমোহিত করে ফেলে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে নিজামের প্রদত্ত স্কলারশিপ নিয়ে তরুণ রাজা ফ্রান্স যাত্রা করলেন, উদ্দেশ্য বিখ্যাত অধ্যাপক লুই ক্যাজামিয়ার কাছে আইরিশ সাহিত্যে গবেষণা।

ভারতীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আমরা দেখি প্রাচীন মানসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আধুনিক সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণেরই অবশ্যাম্ভাবী পরিণাম। তারই অন্যতম ফলশ্রুতি সনাতন উত্তরাধিকারের নিশ্চিন্ততা থেকে মূলচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে রাওয়ের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে দুচারটি কথা বলা প্রয়োজন। রাওয়ের মাতৃভাষা কন্নড় দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন ভাষা-গুলির মধ্যে একটি। মধ্যযুগে প্রাচীন কন্নড় সাহিত্য, বিশেষ করে শেষভাগের বৈষ্ণবধর্মাপ্লুত গীতিকাব্য, অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বস্তুত বৈষ্ণবগীতিরচয়িতা পুরন্দর দাস দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের জনক হিসাবে সম্মানিত ও আদৃত। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে আধুনিকে উত্তরণ কন্নড় সাহিত্যে ব্যহত হয়েছে অবক্ষয়ী হিন্দু সমাজের শামুকধর্মী গোঁড়া ঐতিহ্য বহনের শ্বাসরোধকারী দায়িত্বে, যা মুসলমান অনু-প্রবেশের পর থেকে ভারতের অনেক ভাষার সাহিত্যেই হয়তো পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে কন্নড়ভাষীদের জীবন থেকে তাঁদের লিখিত ভাষার ব্যবধান, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের সাহিত্যের দূরত্ব দিনে দিনে অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠল। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের মৌলিক বিচ্ছেদ আরো সমস্যাসঙ্কুল করে তুলল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রাজা রাওয়ের জীবনের দীর্ঘ অংশে কন্নড়ভাষীদের রাজনৈতিক সত্তা ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। প্রতিবেশী রাজগুলির সঙ্গে কন্নড়ভাষী অঞ্চলগুলিকে ভেঙেচুড়ে যদৃচ্ছভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমরা বঙ্গভাষী সম্প্রদায় বেশ কয়েকশ' বছর ধরে একই শাসনতন্ত্রের গণ্ডীভুক্ত হয়ে যে সংহতি অন্তত কোন কোন সময়ে জীবনের দুএকটি ক্ষেত্রেও বোধ করতে পেরেছি, সে সংহতির পেছনে আমাদের মুসলমান শাসকদের অবদান, তাঁদের বঙ্গভাষার প্রতি আনুকূল্য স্মরণীয়। আমাদের সাহিত্য ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে খানিকটা জাতীয় সত্তার উন্মেষ এক সময়ে ঘটবার মত পরিস্থিতি হয়েছিল, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া দক্ষিণভারতীয়দের তুলনায় বাঙালীরা কোনদিনই বোধহয় খুব একটা

কট্টর হিন্দু ছিলেন না। বৌদ্ধযুগ বাংলার ইতিহাসে হয়তো সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়, যে ভূমিকা দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পুনরুত্থানের। যদিও বাংলার মহাযান ঐতিহ্য সংস্কৃতভিত্তিক কিন্তু সে সংস্কৃত বৈদিক বা এমন কি ধ্রুপদী সাহিত্যের পুরোপুরি ধারাবাহী বোধহয় ছিল না, বরং অনেকটাই লোকায়ত। কিন্তু জনগনের ভাষা যে অবহেলিত ছিল না তার প্রমাণ রয়ে গেছে চর্যাপদে। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের মৌলিক মানবতাবোধ বাঙালীজীবন থেকে কোনদিনই পুরোপুরি ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং লোকগীতি ও লোকসাহিত্যের মারফৎ অবিচ্ছিন্ন ধারায় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অপরপক্ষে যদিও প্রাচীন কন্নড় সাহিত্যে জৈন ভিক্ষুদের অবদান অসামান্য কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনের জয়ডঙ্কা তাকে সম্পূর্ণভাবে করেছে অবদমিত এবং ব্রাহ্মণ সত্তার উগ্র "আর্য" ভাবের কাছে দ্রাবিড় কন্নড় ভাষার বিনয়নম্র ভক্তির ধারা নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। যে অনামা বাঙালী কবি সামান্য মানুষ ব্রাহ্মণেতর চাঁদ সওদাগরের কাহিনীকে করুণ ও মহৎ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর কাছে আর্য সত্তার দাপট মানবতাবোধকে পর্যুদস্ত করতে পারে নি। লৌকিক দেবী মনসাকে বৈদিক শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপনে প্রমাণ হয় যে সকলের অজান্তে বাঙালী হিসাবে পরিচয় বঙ্গভাষী লেখকের কাছে হয়তো বহু বছর ধরে যথেষ্ট বলে বিবেচিত।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের কাছে দ্রাবিড় মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে সত্তার প্রশ্নটি জটিল কারণ তাঁর "আর্যত্ব"/"ব্রাহ্মণত্ব" সংস্কৃতরই সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই রাজারাওকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় ইংরিজী সংস্কৃতের মত চিরন্তন মূল্যে অভিষিক্ত, অন্যান্য ভাষা—অর্থাৎ মাতৃভাষা—নগন্য দিশি ("mere vernculars") তিনি দাবী করেন তাঁর ইংরিজী ভাষাশৈলী প্রাচীন সংস্কৃত ধারাশ্রয়ী এবং অনেক দক্ষিণী সমালোচক তাঁর এই তথাকথিত "সংস্কৃত-ভাষী ইংরিজী"র ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। অবশ্য ইংরিজীভাষী লেখক সমালোচকরা—বিখ্যাত উপন্যাসিক লরেন্স ডারেল ও ই. এম. ফর্স্টার সহ—রাওয়ের ইংরিজীতে সংস্কৃত উপাদান খুঁজে পান নি। আধুনিককালে ভাষাতত্ত্বের যে বিপুল বিস্তার হয়েছে, যখন প্রতিটি ভাষার সাংগঠনিক বিন্যাসকে মৌলিক বা বিশিষ্ট গণ্য করা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাওয়ের ঘোষণা অত্যাশ্চর্য। তবে যে পটভূমিতে এ ঘোষণা আদৌ সম্ভব হয়েছে তাতে অংশীদার শুধুমাত্র পারিবারিক বিপর্যয়। কন্নড় ভাষীদের খণ্ডিত রাজনৈতিক সত্তা বা ইংরেজ-

শাসন নয়, এর মূল চলে গেছে হিন্দু জীবন ও সংস্কৃতির গভীরে যেখানে ভারতীয় সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে আর্য-অনার্য দ্রাবিড়ের সংঘাত চিরন্তন।

এ সত্ত্বেও তরুণ রাওয়ের প্রথম সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা যে কন্নড়েই তাতে আধুনিক মাতৃভাষাকেন্দ্রিক প্রবণতার প্রাবল্যই লক্ষিত হয়। অনেকেরই হয়তো জানা নেই ১৯৩০-'৩২ সালে জয়কর্ণাটক নামে কন্নড় পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনাগুলি—ইয়োরোপ ভ্রমণ, রোমাঁ্যা রোল্যাঁর সংগে সাক্ষাৎকার ও একটি দীর্ঘ কবিতা। সাহিত্য হিসাবে এগুলির কোনটিই হয়তো বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করে না, কিন্তু "ইংরেজনবিশ" রাও যে তাঁর লেখক জীবনের প্রারম্ভে মাতৃভাষাকেই সাহিত্যসৃষ্টির স্বাভাবিক বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। বোধহয় বিদেশী ধারায় শিক্ষিত প্রবাসী লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনশীলতার ফলপ্রসূ সংমিশ্রণ তৎকালীন কন্নড় ভাষা ও সাহিত্যের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত দেশীয় বাহন খুঁজে পায় নি। প্রায় একই সময়ে—বড়জোর কয়েকবছরের ব্যবধানে—ইংরিজী যে গল্পগুলি রাও লেখেন সেখানে তাঁর শিল্পী হিসাবে স্বকীয়তার স্বাক্ষর প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়। পরে এগুলি The cow of the Barricades and other stories (1948) নামে সঙ্কলিত। আধুনিক বা মাতৃভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তব অভিজ্ঞতায় কেন্দ্রীভূত হতে চায় বলেই ভারতীয়দের ইংরিজীচর্চার প্রধান সমস্যা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সে সমস্যা এতই মূলাগত যে রাওয়ের প্রথম জীবনের সাহিত্যিক প্রয়াসেই পাঠকদের নজরে পড়ে। মোটামুটি তিনটি ধারায় গল্পগুলিকে ভাগ করা যায়। একটি ধারায় দেখি পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরী বর্তমানের ওপর নির্ভরশীল সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ —বাংলা গল্পউপন্যাসকে যা এখনো একেবারে আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাওয়ের 'যবনী' নিম্নজাতির সম্বলহীনা এক দরিদ্র মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে যার অভিযোগ সোচ্চার নয়, জীবন তার কাটে মফস্বল সহরে সরকারি কর্মচারির গৃহস্থালির কাজে। প্রত্যেক রেভেনিউ ইনস্পেকটারবাবুর বাড়িতে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে সে যে শুধু উদয়াস্ত পরিশ্রমই করে তাই নয়, পরিবারের সব মানুষকে আপন করে নিতে তার ব্যাকুল প্রচেষ্টা এতই নিরন্তর যে নিতান্ত সাময়িক সম্পর্কটুকু স্থায়ী না করতে পারার ব্যর্থতায় অবধারিতভাবে করুণ। তার প্রত্যাশাহীন স্নেহের ক্ষমতা, অনুভূতির স্বার্থহীন সততা পরিবারের শিক্ষিত তরুণটিকে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে

তোলে বটে কিন্তু যবনীর কাছে তার রিক্ত নিরাপত্তাহীন অবহেলিত অস্তিত্ব নিয়ে তিক্ত অসন্তোষ গড়ে তোলার চেয়ে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবাই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। বলাবাহুল্য 'যবনী'তে চিরন্তন ভারতীয় নারীর তথাকথিত নিঃস্বার্থ ত্যাগের ইমেজ ও ব্রাহ্মণ সামন্ততন্ত্রের নিম্নজাতির নম্র বাধ্যতা মেশামেশি হয়ে আছে। সামাজিক বাস্তবতার আর একটু নির্মম রূপ পাই একটি মুদিখানার মালিকানা বিবর্তনে (দ্য লিট্‌ল গ্রাম শপ)। প্রথম মালিক গুজরাটি মুদি মতিলাল, যার প্রাক্তন অভিজাত বংশগরিমা পরিণত হয়েছে অস্বাভাবিক অর্থগৃধ্নুতায়। তার মানসিক বিকৃতির যেন নিরন্তর দৈহিক প্রকাশ বেদনাদায়ক হাঁপানি। একমাত্র জৈবিক আনন্দ হুঁকোটানা যার ওপর তার আসক্তি এমনই দুর্বার যে হুঁকো লুকানোর অপরাধে স্ত্রীকে নির্মম প্রহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা অনুতাপ হয় না। যখন চতুর কোন এক কোটিয়াপল্লীর জমিদারকে টাকা ধার দিয়ে মতিলাল সর্বস্বান্ত, স্বাভাবিকতার সংগে ক্ষীণসূত্রটুকুও তার ছিন্ন হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ছেঁড়াকাগজের টুকরো—তার 'টাকা'—কুড়োতে কুড়োতে একদিন গাড়ি চাপা পড়ে। অথচ এই উন্মাদই যতক্ষণ দাড়িপাল্লা হাতে চাল ডাল তেল নুনের পসরা নিয়ে বসত তখন সে একেবারে সুস্থ, পাইপয়সাটি হিসাবে কমবেশি হত না। তার অপদার্থ পুত্র ভেঙ্কুর আসলে লেখকের দৃষ্টি-নিবদ্ধ তার অবহেলিতা স্ত্রী রতির প্রতি, যে সর্বরকমে লাঞ্ছিত, অপমানিত, যার কাছে প্রতিমুহূর্তের জীবনধারণই একটা অত্যাচার, তার মধ্যেই জীবনীশক্তির এমন দাপট যে সমস্ত দুঃখ হতাশাকে অতিক্রম করে এমন কি প্লেগের মত মহামারীর কবলেও তার জীবনসংগ্রাম অব্যাহত। তার মৃত্যু যেন অসহায় মরণশীল মানুষেরই নিষ্ফল প্রতিবাদ। এরই মধ্যে কিন্তু মুদিখানা ঠিক চলে যাচ্ছে, বহুবছর পরে দেখি ভেঙ্কুর জারজ পুত্র ছোটা সেখানে বসছে, কামনা-বাসনা ব্যর্থতাবেদনার ঊর্ধ্বে চিরন্তন খালি টাকাআনাপাইয়ের লেনদেন। মনস্তাত্বিক ধারার আর একটি গল্প 'আক্কাইয়া'তে আমরা পাই একান্নবর্তী পরিবারে এক বালবিধবা সংসারে শিশুদের দায়িত্ব যে হাসিমুখে বহন করে। তার অপরিতৃপ্ত মাতৃত্ব প্রবল বাৎসল্যে বর্ষিত হয় মাতৃহীন শিশু কিট্টুর ওপর। এই স্নেহধন্য শিশু যখন বড় হয়, বৃদ্ধার জরারোগ কবলিত দেহ তার কাছে অসহনীয়। মৃত্যুর পদধ্বনি শুধু যে দৈহিক অস্তিত্বেরই শেষ নয়, সমস্ত মানবিক সম্পর্কের ইতি, তারই ভয়ঙ্কর উপলব্ধির মুখোমুখি বৃদ্ধার নিদারুণ অসহায়তা মৃত্যুর চেয়ে অনেক মর্মস্পর্শী।

"Akkayya lay there, her eyes white, her face pouchy and husk-like, and she looked at me—a true image of death. Then suddenly she turned towards the wall and cried out: "kittu…kittu…kittu…" like a frightened animal."

আক্কাইয়ার মৃত্যুসংবাদে কিট্টু আর বিমাতা ও পিতা বিরক্ত মনে অসময়ে অশৌচ মুক্তির স্নান সেরে খাওয়াদাওয়ার পর সিনেমায় যায়। মৃত্যুর কাছে মানুষের সম্পর্ক যে কত ভঙ্গুর তা পাশ্চত্য সাহিত্যে বিশেষ করে আধুনিক মানসিকতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ জন্মান্তরে বিশ্বাসহীন মানুষের কাছে মৃত্যুই অস্তিত্বের শেষ, তার পরে শূন্যতা। আরও স্পষ্ট পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুমার্কা অবাস্তব চিরন্তন প্রেমময় ভাবমূর্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ। তবে রাওয়ের সব গল্পই এত নগ্ন ও নির্মম নয়। "এ ক্লায়েন্ট" একটি হালকা সুরের কৌতুক কাহিনী, পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক তরুণ আধুনিক নারীপুরুষের সম্পর্কতে কৌতূহলী, কিন্তু তার দারিদ্র্য আর ব্রাহ্মণ গোঁড়ামি তাকে কেমন করে চিরাচরিত হিন্দু বিবাহে আর্থিক প্রলোভনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করে তারই কাহিনী। গুরুগম্ভীর দিকটি অবশ্য একেবারেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি বরং তরুণ মনস্তত্বে পারদর্শি এক ঘটকের নৈপুন্য প্রজাপতির নির্বন্ধকে অবধারিত করে তোলে। তবে সামাজিক বাস্তবতার সবচেয়ে শক্তিমান অভিব্যক্তি 'ইন খানদেশ'। প্রধানত ভাষাশৈলীতে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক ভারতীয় দরিদ্র গ্রামবাসীর চিত্র যেখানে সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র বিদেশী শাসনের সঙ্গে হাত মেলায়, এমন কি মারাঠা অঞ্চলের তীব্র রুক্ষ প্রকৃতিও যেন এই হতভাগ্য দরিদ্রের প্রতি বিরূপ। মুখ্যচরিত্র দত্তোপন্থ, যার রোগজর্জর শরীর কুসংস্কারচ্ছন্ন মন সর্বদা বৃটিশরাজের জুলুমে তটস্থ। দিকে দিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হয় মহারাজা ও ভাইসরয়ের ট্রেন যখন গ্রামের পাশে রেল লাইন দিয়ে যাবে তখন সব গ্রামবাসী যেন সাবেকী পোষাক, কোমরবন্ধ তলোয়ার ইত্যদিতে সজ্জিত হয়ে ধাবমান গাড়িকে অভিবাদন করে। দত্তোপন্থের মনে পড়ে তার সোনাকে কিরকম বেধড়ক ধোলাই খেতে হয়েছিল দারোগাবাবুকে দেখে গরুরগাড়ি থামায়নি বলে। কত অসংখ্যবার তাকে আর্দালি পিয়নদের তুষ্ট করার জন্য ভালমন্দ যোগাতে হয়েছে, কতবার নীচু হয়ে সেলাম ঠুকতে হয়েছে আর প্রতিদানে

অবজ্ঞার থুৎকার লাভ। তার জীবনের আশাহীন নিষ্করুণ বাস্তব প্রতিফলিত তার চারিদিকের প্রকৃতিতে, খান্দেশের বন্ধ্যা মাটি—

"In Khandesh the earth is black. Black and gray as the buffalo, and twisted like an endless line of loamy pythons, wriggling and stretching beneath the awful heat of the sun. Between a python and a python is a crevice deep as hell's depth, and black and greedy and forbidding as demons' mouths···Field on field is nothing but pythons and abysms —crocodiles waiting for their prey, vermin searching for a carcass. Then suddenly, there is a yawning ravine in the endless immensity of the python-world, the chief python of pythons with his venom flowing in red and blue and white. The red venom shines in the sand. The blue one lies in the shadow. And the white is bubbling gleaming water that crawls over the bed, as though the pus of heaven had turned liquid. The blood of the earth mingles with the pus of the skies—to bear cotton.

যে ফসল এই কৃপণ প্রকৃতির মুষ্টিভিক্ষা তার বর্ণনায় প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ভাবালুতার লেশমাত্র নেই, বরং দত্তোপন্থের মত সাধারণ কৃষকের প্রাত্যহিক সমস্যার সংগে তার যে অবিচ্ছেদ্য যোগ সেই ব্যঞ্জনাকেই মূর্ত করে তুলেছে

Rows and rows of cotton. Thin, unmoving, bone-like plants, with little skulls in their hands that split and crackle with the heat of the sun···Black seeds, small knob like seeds sitting beside one another as though in clasped conspiracy, The pods would go to the dust, the cotton to the redman, and the peasant will have small knob-like seeds, hard as the river stones, to munch and to crack. There are no stones in Khandesh, The sun will hit him on the head, the earth will maul him by the legs, the redman eat all his son—and within the

black and blue of the ravines the white venom will flow to the end of the time. The trains of the red man rush towards the city."

দুপুরের অসহ্য গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা মাঠে মারঠি প্রজার সাবেকি জোব্বা কোমরবন্ধ ইত্যাদিতে আবদ্ধ শ্রান্ত বিভ্রান্ত রুগ্ন দত্তোপন্থ এই ট্রেনের সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে দিশি বা বিলিতি কোন রাজদর্শনের পুণ্যলাভই তার হয় না, কারণ ট্রেনটি ছিল ভাইসরয়ের ট্রেনের অগ্রগামী দূত। যে মানসিক বিপর্যয়ের গতি প্রথম থেকেই চিহ্নিত, সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাতসংঘাতের যেখানে প্রাচীনের রাজভক্তির সংগে লাঠালাঠি বেঁধেছে নবীনের জাতীয়তাবাদ সেই পরিবেশে তার গতি হয় ত্বরান্বিত। দত্তোপন্থের জীবনের অমোঘ পরিণতির আভাষ ব্যক্ত গল্পের প্রতিটি চিত্রকল্পে, তাদের নিষ্ঠুর তীব্রতা একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই সুস্পষ্ট হবে বাঙালী পাঠকদের কাছে :—

"Somebody was walking down the twist of the ravine, an ass behind him. His shadow is black as congealed blood."

তরুণ বয়সের লেখা হিসাবে 'ইন খান্দেশ' বোধহয় অতুলনীয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে বাস্তব সম্পূর্ণ অপসৃত, স্থানকালপাত্রসমাজ পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক বিশিষ্টতা—সবই অপ্রাসঙ্গিক। "কমপ্যানিয়নস" এ পাই অতি সাধারণ এক মুসলমান ঝুড়িনির্মাতা, বিশাল সাপ—শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—যার সঙ্গী হয়েছে। কেমন করে সাপের দৌলতে সে জাতব্যবসা ছেড়ে, স্থূল ঐহিক জীবনে আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হ'ল ও শেষে দুজনে পবিত্র জীবন যাপন করে এক উপকথায় পরিণত হ'ল তারই কাহিনী। 'কনকপাল, প্রটেক্টর অফ দ্য গোল্ড'-এ কনকপাল এক বিশাল নাগ, সিদ্ধ পুরুষ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের গচ্ছিত ধনরত্নের প্রহরী। ব্রাহ্মণের অপদার্থ আধুনিক বংশধরেরা যখন অর্থ-লোভে কনকপালকে বাইরে অন্য ঘরে বন্ধ করে, ঠাকুর ঘরের মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বের করতে চেষ্টা করে তখন ক্রুদ্ধ নাগ চারিদিকের দেওয়ালে সব বিষ উজাড় করেও তাদের বাধা দেবার কোন পথই পায় না, তখন বাইরে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত অন্য মন্দিরটির দেবতার সামনে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবাদে আত্মঘাতী হয়। লোভী উত্তরাধিকারীরা হ'ল চিরকালের জন্য অভিশপ্ত, বলাবাহুল্য দেবতার ধন রয়ে গেল আপ্রাপণীয়, আজও ভেসে আসে মাটির তলায় টুং টাং মোহরের শব্দ। এ ধরণের গল্প উপকথা হিসাবে উপভোগ্য

কিন্তু অনেকেরই মনে হতে পারে '৩০ দশকের ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিতে যে ডামাডোল চলছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে একজন তরুণ লেখকের সচেতন রূপকথা সৃষ্টি পলায়নী মনোভাবেরই স্বাক্ষর। কিন্তু রাওয়ের আসলরুতিত্ব বাস্তবগ্রাহী চিত্রাঙ্কন বা রূপকথার অন্য জগতে নয়, তাঁর প্রকৃত এবং নিজস্ব প্রতিভার ক্ষেত্র বাস্তব ও রূপকথার নিপুণ সংমিশ্রণে যা আমরা দেখি তৃতীয় ধারার গল্পগুলিতে। 'নরসিগা' নিম্নজাতির আশ্রমপালিত এক অনাথ বালক, যে আশ্রমবাসিদের কাছে নতুন দেশাত্মবোধ, গান্ধীবাদের কথা শোনে। তার পুরাতন সংস্কার স্বচ্ছন্দে রাম রাবণ সীতার ভূমিকায় গান্ধী, ইংরেজ ও ভারতমাতাকে স্থাপন করে শৈশবের নিশ্চিন্ত কল্পনার জগতে বাস করে—যে জগতের নির্বিচার বিশ্বাস কোন ঘটনাশ্রয়ী হতাশা চূর্ণ করতে পারে না। আঙ্গিকের দিক থেকে এ গল্পটি হাত-মক্স করা পর্যায় পড়ে, তবে এ ধরণেরই প্রায় বিষয় নিয়ে রাওয়ের প্রধান আখ্যান 'দ্য কাউ অফ্ দ্য ব্যারিকেডস' নিঃসন্দেহে একটি সার্থক সৃষ্টি কারণ এখানে রূপকথাকে জোর করে বাস্তবের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ইতিহাসের গতিকে চিরন্তন সত্যের রূপ দিয়েছে। ছোট এক শহরে নামহীন আশ্রমে গুরু আর ভক্তরা প্রবৃত্ত নতুন সাধনায়—গান্ধীবাদী দেশপ্রেম ও '৩০ দশকের বাস্তবে এ পরিস্থিতি মোটেই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু বিস্ময় জাগায় গল্পটির মুখ্য চরিত্র—একটি গাভী। প্রতি মঙ্গলবার কোথা থেকে সে আসে তাদের আশ্রমে, হাঁটু গেড়ে যেন গুরুকে অভিবাদন জানায়। তাঁর মাথায় মুখ ঘসে তাঁর হাতে দুটি খেয়ে সে ফিরে যায় কোথায় তার হদিশ কেউ জানে না। গুরু তার নাম দেন গৌরী (উল্লেখযোগ্য রাওয়ের সব আত্মজীবনীমূলক রচনায় তাঁর নিজের মায়ের নাম গৌরী), ক্রমে দেখা যায় যায় আশ্রমের আবহাওয়াতেই যেন শান্তি বিরাজমান। ইঁদুর বেড়াল সাপ এক সঙ্গে খেলা করে। গুরু বলেন "Perhaps she is great Mother's vehicle।" গৌরীর আধ্যাত্মিক মহিমার কথা রাষ্ট্র হতে সময় লাগে না—ব্যবসায়ী, পরীক্ষার্থী, কন্যাদায়গ্রস্ত, সকলে গৌরীর প্রসাদ ভিক্ষায় বিনত। কিন্তু কোন উপচার সে কখনো গ্রহণ করে না। এমন সময় শুরু হয় মহাত্মাজীর গোড়াদের-কথা-না-মানা আন্দোলন। শহরের বাসিন্দাদের অভ্যুত্থান রূপকথার নির্বিশেষ ভাবাবহে প্রকাশিত যেখানে আধুনিক গল্পের প্রাত্যহিক বিশিষ্টতার খুঁটিনাটি সযত্নে বর্জিত, বরং বাইবেলের সুপ্রসিদ্ধ ভাষাশৈলীর অনুগামী তার পৌনঃপুনিক সহজ সরল সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা :

"The Mahatma said : Don't buy their cloth. And people did not buy their cloth. The Mahatma said : Don't serve under them. And people did not serve under them. And the Mahatma said : 'Don't pay their taxes', and people did not pay the taxes ."

গোরা পুলিশ যখন প্রতিশোধের অত্যাচার চালাতে শুরু করে, আত্মরক্ষার্থে শ্রমিক মজদুররা গড়ে তোলে সারি সারি ব্যারিকেড। অহিংসাপন্থী গুরু এই প্রতিরোধকে মেনে নিতে অপারগ, "No barricades in the name of the Mahatma।" কিন্তু যখন মানুষের জীবন বিপন্ন, বিপন্ন ক্ষুধার অন্ন, কেউ কান দেয় না অহিংসার আদর্শে, ক্রুদ্ধ বাসিন্দারা অধিকার করে বসে সহরের শাসন, গোরাদের প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য গড়া হয় বিশাল ব্যারিকেড। বিপন্ন গুরু আর তাদের নেতা নন, তিনি সব ত্যাগ করে বসেন ধ্যানে যাতে "the city might be saved from bloodshed।" সেদিন ছিল মঙ্গলবার, দেখা গেল গৌরী আসছে। কিন্তু আজ সে আশ্রমমুখী নয়, ধীর পদে নত মস্তকে চলেছে ব্যারিকেডের দিকে। জনগণের মনে বিপুল আশ্বাস দেখা দেয়। "She will protect us।" কুমকুম চন্দন ধূপদীপের আরতিতে গৌরীর যাত্রাপথের মঙ্গলকামনা করে তারা। গৌরী যখন আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে উঁচু ব্যারিকেডের মাথায়, এ পাশে উন্মত্ত শ্রমিক মজদুর, ওপাশে হিংস্র বিদেশীর পোষা ভারতীয় সেনা সবাই স্তম্ভিত, শাসক শাসিতর কণ্ঠ হতে এক সঙ্গে উচ্চারিত স্বতঃস্ফূর্ত রব "বন্দে মাতরম্"। অবস্থা বেগতিক দেখে গোরা পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল, গুলি এসে বিধঁল গৌরীর শুভ্র কপালে—"and she fell, a vehicle of god among lowly men।" পরে যখন শান্তি ফিরে এল শেঠ যমনলাল দ্বারকাচাঁদ বানিয়ে দিলেন বিরাট এক শক্ত পোক্ত গৌরীর মূর্তি, আসল গৌরী কিন্তু অনেক ছোট, অনেক কোমল ছিল। রেলওয়ে স্টেশানে ফেরীওয়ালারা চাকা লাগানো ছোট ছোট কাঠের গৌরী বিক্রী করতে লাগল।

রহস্যময়ী গৌরী যদিও দেবীর বাহন এবং সে হিসাবে প্রায় এখানে অবতারের মর্যাদায় অভিষিক্ত। কিন্তু তার পরিণাম যে আত্মদানে তার সাহিত্যিক পটভূমি তা খুব একটা "হিন্দু" নয়। আমাদের পরম্পরায় দেবতারা এমনই সর্বশক্তিমান যে তাঁদের প্রসাদপুষ্ট প্রার্থীর কোন জীবই কখনো অন্যায়ের কাছে, অধর্মের কাছে পরাস্ত হয় না, সূর্যপুত্র কর্ণ ধর্মের বিরোধীপক্ষে থেকে মহাকবিকে এমনই ফ্যাসাদে

ফেলেছিলেন যে কৌশলে তাঁর কবচকুণ্ডল অপহরণ করেই তাঁকে ট্র্যাজিক নিয়তির কাছে বলি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাই "শাহিদ" শব্দটাই আমাদের ধার করতে হয়েছে। অন্যের পাপের জন্য শাস্তির বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেওয়া মানব ইতিহাসে খৃষ্টের অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সামান্যর জন্য অসামান্যর আত্মোৎসর্গ একটি চিরায়ত আখ্যান। ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তব চিত্রে এমন বিদেশী রূপমূল (বা **archetype**) অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রোথিত হতে পেরেছে তার কৃতিত্বের ভাগী লেখকের সংবেদনশীল প্রতীক-নির্বাচন ও ভাষায় কালজয়ী শৈলীর অনুসরণে। গোমাতার সুপ্রাচীন একান্ত ভারতীয় সাত্বিক মহিমাকে নতুন করে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন ভাষা ও আঙ্গিকের মারফৎ যা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ধারাবাহী। স্রষ্টার কল্পনায় যে ভবিষ্যদ্রষ্টার উপলব্ধি লুকিয়ে আছে গৌরীর আত্মদ্যুতিতে, বহু বছর পরে গান্ধীজীর মর্মান্তিক পরিণতির পূর্বগামী ছায়া দেখতে পাওয়া হয়তো নেহাৎই কাকতালীয় যোগাযোগ। তার চেয়ে বড় কথা আমাদের সৃষ্টিশীলতায় পশ্চিম আজ কত গভীরে প্রতিষ্ঠিত এবং এ-ধরনের ইংরিজী রচনাতে তার সার্থক প্রকাশ ঠিক তার অনুরূপ অভিব্যক্তি হয়তো ভারতীয় ভাষার গদ্য সাহিত্যে আমরা সচরাচর পাই না। এখানেই ভারতীয়ের ইংরিজীচর্চার মৌলিক অবদান।

প্রসঙ্গক্রমে গল্পসংকলনটির উৎসর্গপত্র উল্লেখযোগ্য :

"To Camille/who made me/and made the stories/that I made."

ফ্রান্সে পৌছাবার প্রায় অব্যবহিত পরেই রাজা রাও ক্যামিল মুলি নামে এক ফরাসী বুদ্ধিজীবীর প্রেমে পড়েন এবং ১৯২৯ সালে অর্থাৎ সাবালকত্ব প্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বিবাহ করে ফেলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আজও তাঁর রূপ, বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বকে মনে রেখেছেন ভারত-তত্ত্ববিদ জ্যাঁ হেবের যাঁর সঙ্গে শ্রীমতী কামিল শ্রীঅরবিন্দর রচনাবলী দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে অনুবাদ করেছিলেন। রাওয়ের শিল্পী সত্তা বিকাশে ফরাসী পত্নীর প্রভাব অপরিমেয়। তিনিই প্রথম ভাষার সৃজনশীল ব্যবহার সম্পর্কে রাওকে সচেতন করে তোলেন এবং ভারতীয়দের ইংরিজীচর্চার যা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—সেই "বাবু" ইংরেজীর সাহিত্যিক ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমন কি "মেকলে মার্কা ইংরিজী লেখার চেয়ে না লেখা ভাল" এই নিষ্করুণ মন্তব্যসহ রাওয়ের প্রথম দিককার অনেক লেখাই তিনি বাতিল করে দেন। যে ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাওকে

অভিভূত করেছিল তার বিশাল ঐশ্বর্যে শ্রীমতী ক্যামিল যেন তারই জীবন প্রতীক হিসাবে তাঁর লেখক সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন। কিন্তু রাওয়ের ভারতীয় রক্ত তাঁকে স্বদেশের তৎকালীন সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকতে দেয় নি। ৩০ দশকের শেষের দিকে দেখি তাঁর অস্থিরতা—ফ্রান্সে ট্রটস্কিপন্থী শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে দহরমমহরম, জওহরলাল নেহেরুর সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর লেখাগুলির সঙ্কলনসম্পাদনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ, কে. জাটোয়ার সিং-এর সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে **Young India** নামে একটি প্রগতিবাদী পত্রিকা চালানোর প্রচেষ্টা আধুনিক ভারতীয় গল্পরচনার ইংরেজী অনুবাদ সম্পাদনা ইত্যাদি সাহিত্যিক রাজনৈতিক কাজকর্মে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেখা চিঠিতে দেখি রাও নিজেকে নেহেরুর শিষ্য এবং "চরমপন্থী" বলে বর্ণনা করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। ৪২-এর আন্দোলনে তিনি সোস্যালিস্টদের সহচর। অর্থাৎ তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য প্রথম সারির ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মতই তদানীন্তন সমস্যাগুলিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট।

তৎকালীন বাস্তবে সম্পূর্ণ মনসংযোগের ফলশ্রুতি প্রথম উপন্যাস কণ্ঠপুর (১৯০৮) ভারতীয় জনমানসে নবজাগরণ চিত্রণে একটি ন্যায়নিষ্ঠ প্রচেষ্টা। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'র (১৯৪২) মতই 'কণ্ঠপুর' একটি জনসমষ্টির চিত্র। দক্ষিণ ভারতের একটি রক্ষণশীল হিন্দুগ্রামে গান্ধীবাদের প্রবেশ কীভাবে প্রাচীন স্থিতিশীল ভেদপন্থী সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ করে সমকালীন ইতিহাসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তারই কাহিনী। প্রারম্ভে দেখি কণ্ঠপুর গ্রামে বর্ণাশ্রমে কেন্দ্রীভূত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ স্বয়ং আবর্তিত জীবনযাত্রা এমনই সনাতন যে হরিকথা, কীর্তনে অবসর বিনোদনের সীমিত ক্ষেত্রগুলি পর্যন্ত গোঁড়া হিন্দুয়ানির পবিত্র ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন। এই পরিবেশে গাঁয়ের যুবক মূর্তি গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় বিদেশী বস্ত্রত্যাগ ও বিদেশী শিক্ষা বর্জন করে সহর থেকে জন্মস্থলে ফিরে আসে, শুরু করে **"Gandhi business"**—অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নিম্নশ্রেণীর ভিতর সাক্ষরতা প্রচার ও চরকাকাটা। সর্বরকম জাতের মানুষই যে তার সঙ্গে আস্তে আস্তে যোগ দেয় তার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণ যুবকটির সামাজিক মর্যাদা ও চারিত্রিক মহিমা। তবে তার বিরোধীরা - বিশেষভাবে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দলপতি ভট্টসহ— সচেষ্ট, গান্ধীবাদ যে হিন্দুধর্মকে রসাতলে দিচ্ছে তা তাঁরা নীরবে সহ্য করতে

নারাজ। বাধা সত্ত্বেও মৃতির উৎসাহ উদ্দীপনা শুধু নিজের গাঁয়েই নয় পার্শ্ববর্তী কফিবাগিচার কুলিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে—যেখানে ৩০ দশকের ভারতীয় সাম্যবাদীদের প্রচলিত ধ্যানধারণা অনুযায়ী সাদা চামড়ার মালিক কালো চামড়ার কুলিদের ওপর যথারীতি নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। মৃতিকে একঘরে করা হয়, তার বিধবা মা ব্রাহ্মণ বংশের এ বিপর্যয়ের শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু মৃতি পিছু পা হয় না, উত্তরাধিকারের দণ্ডকে ত্যাগ করার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অস্পৃশ্যের কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করে। কণ্ঠপুরে কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। মৃতির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট জাতীয় কর্মসূচীতে যোগ দেয়—তাড়িখানা পিকেট, খাজনা না দেওয়া ইত্যাদি যার পরিণতি মৃতি সহ নেতৃস্থানীয়দের কারাবাস এবং কণ্ঠপুরের যাবতীয় চাষজমি খাজনা অনাদায়ে নিলামে অপরিচিত আগন্তুকদের কাছে বিক্রয়। বেপরোয়া গ্রামবাসীদের অস্তিত্ব বাঁচাবার অন্তিম চেষ্টার সমাপ্তি হয় পুলিশের সঙ্গে সরাসরি হাতাহাতি যুদ্ধে—অর্থাৎ অহিংসার মহান আদর্শের পরাজয়ে। ছিন্নমূল কৃষকদল ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে ও ধীরে ধীরে সনাতন হিন্দুনরুপত্রব জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। কিন্তু মৃতি ও তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীরা গান্ধীবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যোগ দেয় "equal distributionist"-দের দলে।

উপন্যাসের উৎকর্ষ যদি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক অস্তিত্বে, সময়নির্ভর মানব জীবনের প্রামাণ্য তথ্যচিত্র অঙ্কণে তাহলে 'কণ্ঠপুরের' সার্থকতায় সন্দেহ থাকতে পারে না। রাও নিজে যদিও একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী। কিন্তু একজন সংবেদনশীল লেখক হিসেবে গান্ধীবাদের বাস্তবরূপায়ণে মানবচরিত্রের দুর্বলতা ও সীমিত ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন। গান্ধীবাদের অতিসংক্ষিপ্ত সারমর্মও যে ("Spin and practise ahimsa and speak the truth") ভারতের আপামর জনসাধারণের পক্ষে সর্বাংশে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসে যোগদান করা সময়ও অস্পৃশ্যদের মন্দিরের দেবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার অধিকার হয় না। সর্বোপরি জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় উচ্চবর্ণ ও ধনিক সম্প্রদায়েরই আধিপত্য ছিল—তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে এ বাস্তবচিত্র দলিল হিসাবে নিশ্চয়ই নিষ্ঠাবান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য ভারতীয় ইংরিজী উপন্যাসেও আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে হিন্দুসমাজের কায়েমী স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাই, যেমন কে, এ, আব্বাসের Inquilab। মুলক রাজ আনন্দের "The Sword and the Sickle এবং আর, কে, নারায়ণের Waiting for the Mahatma। যখন দেখি গান্ধীজীর অত্যুচ্চ নৈতিক আদর্শের ব্যবহারিক ব্যর্থতা, তাঁর আপোষপন্থী মনোভাবজাত অসম্পূর্ণ বিপ্লব, তাঁর "স্বরাজ" সম্পর্কে ধারণার ভাবালু অস্পষ্টতা রাওয়ের প্রগতিবাদী নায়ককে ক্ষুব্ধ করে তখন আমাদের বাঙালী নায়ক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ("শিলালিপি") মত কন্নড় মৃতিকে ভারতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে মধ্যবিত্ত যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। লেখক হিসাবে জীবনের আরম্ভে, ভারতীয় বাস্তব, ভারতীয় সমস্যা ও ভারতীয় অস্তিত্বে রাওয়ের অভিনিবেশ যে আন্তরিক সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা নেহাৎই অন্যায়।

প্রশ্ন হল এমন খাঁটি ভারতীয় ইতিহাসাশ্রয়ী চিত্রে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কোথায়, যে সমস্যা প্রবন্ধের গোড়াতেই ভারতীয় ইংরিজীচর্চার মূলগত বলা হয়েছে? সৃজনধর্মী যে কোন কীর্তি বিশ্লেষণে প্রথমেই ধরে নেওয়া প্রয়োজন সামাজিক রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হতে পারে না কারণ বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য নান্দনিক সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান মাত্র। বস্তুত সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য (যেমন সামাজিক বাস্তবতা) কোন অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই প্রাধান্য অর্জন করেনি। যেহেতু সাহিত্যের বাহন মানবসমাজ ব্যবহৃত ভাষা এবং উপন্যাসে উপস্থাপিত আখ্যানটি জীবনের অনুরূপ স্থান-কাল-পাত্র সম্বলিত একটি বানানো জগৎ যা এমনি যুক্তিগ্রাহ্য যে পাঠক স্বেচ্ছায় অবিশ্বাসকে মূলতবি রাখে, সেইজন্য উপন্যাসের সংগে বাস্তবের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং বিষয়বস্তু হিসাবে জীবনের প্রতিফলন সমালোচনার আওতায় আদৌ আসে না। শিল্পের সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। শিল্পকীর্তির বিভিন্ন সাংগঠনিক উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা বিশ্লেষণ। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত নিবিড় সম্পর্কটি এবং সে সম্পর্কের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করে রসোপলব্ধিতে সাহায্যে করাই সমালোচকের কর্তব্য।

রাজা রাওয়ের নিজের মতে কণ্ঠপুরের ইতিকথা একটি স্থলপুরাণ। পাঁচালি পাঠের ঢং-এ কণ্ঠপুরের স্থানীয় দেবী কেঞ্চাম্মার মাহাত্ম্য বিবরণে উপন্যাসের আরম্ভ যেখানে রূপকথায় অমর কণ্ঠপুরের প্রাগৈতিহাসিক অতীত। কেঞ্চাম্মার এই মন্দির কণ্ঠপুরের অধিবাসীদের চিরাচরিত কৃষিভিত্তিক জীবনের কেন্দ্র। আশ্চর্য ব্যাপার কণ্ঠপুরের আধুনিক ইতিবৃত্ত যা উপন্যাসের ঘটনাবলী, তাতে

কিন্তু কেন্দ্র স্থান দখল করে আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবালয়—কণ্ঠপুরীশ্বরীর মন্দির যা একেবারে আধুনিক, নায়ক মূর্তির উৎসাহে স্থাপিত। গান্ধীজীর মতাদর্শ প্রচার, কংগ্রেস কমিটি গঠন, আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান, পুলিশের নিপীড়নে লাঞ্ছিতা অসহায় নারীদের আশ্রয়, অন্তিম প্রতিরোধের প্রস্তুতি-অর্থাৎ কাহিনীর অগ্রসরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু ছুঁয়ে আছে এই সামান্য দেবস্থান যা কোন সময়োত্তীর্ণ উপকথার মহিমায় মহিমান্বিত নয়। কণ্ঠপুরের চিরন্তন সত্তা আর তার বর্তমান প্রতিফলন কেষ্টামা আর কণ্ঠপুরীশ্বরীর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় এবং এই দুই মন্দিরের মধ্যে যে কোন সংযোগ নেই তা যেন গ্রামটির প্রাচীন ঐতিহ্য ও নবীন মতবাদের মধ্যে মিলনেরই অভাব সূচনা করে। তাই আধুনিক স্থল পুরাণের পরিণতি জনপদটির যে সম্পূর্ণ অবলুপ্তিতে পৌরাণিক পরম্পরায় তা হয়তো অভাবনীয়। বাস্তবানুগ পরিণামের কথা মনে রেখেই রাও যোগ করে ছিলেন, 'কণ্ঠপুর' রূপকথাশ্রয়ী ইতিহাস (**legendary history**)। চিরন্তন ও বর্তমানের মিলন। জাতির জনক হিসাবে গান্ধীজির মানবধর্মী জাতীয়তাবাদ অতীত ও বর্তমানের সেতু। গোঁড়া হিন্দু গ্রামবাসীর কাছে মহাত্মার আবির্ভাব পৌরাণিক অবতারের মতই অলৌকিক। জয়রামাচারের জনপ্রিয় হরিকথায় গান্ধীজন্ম বাল্মীকির অনুরোধে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে ব্রহ্মার বরে শিবের অবতার রূপে অবতরণ। প্রায় ঐশ্বরিক মহিমায় তাঁর মতবাদের প্রচার, যুক্তি তর্ক যেমন দৈবাদেশের নাগাল পায় না। পবিত্র হিন্দু ধূপ ধুনায় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ব্যবহারিক প্রয়োজন আচ্ছন্ন "**To wear cloth spun and woven with your own hand is sacred**"। "**Spining is as purifying as praying**"। ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীর অবতার মূর্তি যে কত সুপ্রচলিত ছিল তার নিদর্শন অন্যান্য ভারতীয় ইংরিজী উপন্যাসেও পাওয়া যায়, বিশেষ করে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের **My brother's Face**, মুলকরাজ আনন্দের **Untouchable** ও **The Sword and the sickle** এবং কে, এ, আব্বাসের **Inquilab**-এ। অবশ্য কোনটিতেই গান্ধীনির্দিষ্ট পন্থা ঠিক প্রধান উপজীব্য নয়। 'কণ্ঠপুরে' গান্ধীর ভূমিকা মূলগত, বিষয়বস্তু বিন্যাসের কেন্দ্র। কাহিনীর প্রধান চরিত্র মূর্তি ঘটনাবলীর নিয়ামক একান্তভাবেই গান্ধীভক্ত রূপে এমনকি গান্ধীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার প্রায় দেবদর্শনের সমতুল্য হিসাবে চিত্রিত। পৌরাণিক ঐতিহ্য ভক্ত প্রহ্লাদের যে রূপমূল ভারতীয় মানসে সদ্যজাগ্রত তাকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো হয়েছে মূর্তির প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বিস্তারিত উল্লেখে।

তাই দেবমন্দিরই নতুন অবতারের নবীন ধর্মপ্রচারের সর্বতোভাবে উপযুক্ত। অথচ কাহিনীতে আমরা দেখি অবতীর্ণ মহাপুরুষের প্রচারিত মতাদর্শের সামগ্রিক ব্যর্থতা। তাঁর প্রসাদধন্য জনসমষ্টির নিষ্ঠুর বিনাশ। সর্বোপরি তাঁর মুখ্যভক্তের অনায়াসে প্রভু ত্যাগ। এ যেন প্রহ্লাদের শ্রীবিষ্ণু বিসর্জন—যা হয়তো কণ্ঠপুরের প্রাচীন হিন্দু পটভূমিতে পাঠকের চোখে একান্তভাবেই বেমানান। প্রসঙ্গক্রমে সতীনাথ ভাদুড়ীর মহান এপিক উপন্যাস ঢোঁড়াইচরিত স্মর্তব্য যেখানে অজ্ঞ আদিম জনমানসের প্রতিভূ তরুণ ঢোঁড়াই "গান্‌হি বাওয়া"র চেলা হিসাবে সুরু করে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে নিবেদন করে ধীরে ধীরে পরিণত হয় মধ্যবয়সী রামায়ণজীতে। বাংলা উপন্যাসে প্রাচীনপন্থী জীবনে অনড় অটল অন্ধ ভক্তি আধুনিকতার সচেতন ও জীবন্ত শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত। অতীত থেকে বর্তমানের উত্তরণে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন প্রাণস্পন্দনের চিরন্তনী ছন্দ অনুভব করি। অন্যদিকে রাজা রাওয়ের "কণ্ঠপুরে" পাই অতীত ও বর্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। গীতার বিখ্যাত শ্লোক "যদা যদা হি ধর্মস্য" যা উপন্যাসটির প্রথম দিককার সংস্করণে ছিল মূলমন্ত্র হিসাবে উৎকীর্ণ এবং পরের সংস্করণগুলিতে বর্জিত, কাহিনীতে উচ্চারিত হয় জাতীয়তাবাদবিরোধী গোঁড়া হিন্দুর মুখে। অথচ গান্ধীকে অবতার হিসাবে চিত্রণের যৌক্তিকতা এই শ্লোকটিতেই প্রতিষ্ঠিত। আবার এই শ্লোকটিতেই গান্ধী বিরোধিরা ইংরেজরাজকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান "**Whensoever there is ignorance and corrarption I came—says Krishna the defender of dharma, and the British came to protect our dharma.**" রাওয়ের গান্ধীভক্তরা রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে সর্বদা পরাস্ত। ব্রাহ্মণ ধর্মে মৌলিক মানবতাবোধের দৈন্য—অস্পৃশ্যতা যার একটি রূপ—কোন গান্ধীবাদী মাথা উঁচু করে জোর গলায় অপর পক্ষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন না। বরং গান্ধীর মতবাদ প্রচারের কাল যে "**Our eternal dharma will be squashed like a louse in a child's hair** কারণ "**there will be neither brahmin nor Pariah**"। অতএব মূর্তির বৃদ্ধা মাতার ক্ষুব্ধ আক্ষেপ "**Oh, this Gandhi! Would he were destroyed**, বহু বছর বাদে হিন্দু চরমপন্থীদের হাতে জাতির জনকের নির্মম বিনাশেরই বোধহয় পূর্বলক্ষণ মাত্র। এ চিত্র শুধু যে লেখকের নিজের জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সত্তার পরস্পর সংঘাতের পরিণাম তা হয়তো নয়,

বোধহয় মহাত্মার প্রতি সমগ্র হিন্দু মানসিকতার দ্ব্যর্থ দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সাহিত্যিক রূপান্তর।

তাই বিংশ শতাব্দীর হিন্দু অবতার পরিণত নিষ্ফল দেবতায়। লেখকের পুরাণধর্মী উপন্যাসের সংগঠনে যে মূলকেন্দ্র সেই গান্ধীজীর পরিকল্পনাতেই দ্বিধা ও গভীর স্ববিরোধ যার প্রকাশ আঙ্গিকে ও ভাষা শৈলীতে। উপন্যাসের বক্তা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ বিধবা যিনি একদিকে সনাতন গ্রামীন সমাজের প্রতিভূ, অন্যদিকে তরুণ মৃতিকে পিতামহীর স্নেহে গ্রহণ করার ইচ্ছায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার সহযাত্রী। তৃতীয় ব্যক্তি বা নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে তাঁর কাহিনীর উপস্থাপনা ও চরিত্রের বর্ণনা কয়েকটি নিপুণ ও সুস্পষ্ট টানে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ। কিন্তু ঘটনার স্রোতে প্রত্যক্ষ যোগদানকারী হয়ে যখন তিনি আন্দোলনের একটি অতিবাস্তব বর্ণনা দিতে সচেষ্ট, আমরা লাভ করি হাল্কা তুলির অজস্র বিশৃঙ্খল আঁচড়ে এক ভাসাভাসা রেখাচিত্র মাত্র যা রচনারীতির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। উপন্যাসে বা যে কোন আখ্যানের প্রারম্ভে যে চরিত্রগুলির সঙ্গে আমরা প্রথম থেকে পরিচিত হই। ঘটনাবলীর ঘাত-সংঘাতের বিশেষ করে চরম সংকটে তাদের যে ভূমিকা তার ভিতর দিয়ে চরিত্র-গুলি আমাদের চোখে পূর্ণতা লাভ করে। যে আন্দোলনে কণ্ঠপুরের প্রাচীন অস্তিত্বই লুপ্ত হল, যার বিশদ বর্ণনা বইটির প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে সেখানে প্রধান চরিত্রগুলির সকলেই প্রায় বেশির ভাগ সময় অনুপস্থিত, শূন্য স্থানে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য স্বল্প পরিচিত বা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। উপসংহারে নায়ক মূর্তির গান্ধীভক্তি থেকে গান্ধীসমালোচনাকে অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের সে বর্ণনা সেরে দেওয়া হয়েছে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে। কথাশিল্পের যে পাশ্চাত্য ধারায় ব্যক্তি চরিত্রই সমষ্টির প্রতিনিধি, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রচিত্রণেই সমাজ, সময় ও জীবনদর্শন পরিস্ফুটিত। সেই প্রথাসিদ্ধ ধারার সংগে ভারতীয় শিল্পীর সংযোগ এখানে অনিশ্চিত। প্রসঙ্গক্রমে ডিকেন্সের A Tale of Two cities, বা আঁদ্রে মালরোর La condition humaine ও Lespoir প্রভৃতি উপন্যাসে হিংসাত্মক ঘটনা, জনগণের বিদ্রোহ ইত্যাদির বর্ণনার কৌশল স্মরণীয়। রাওয়ের কার্যপ্রবাহ বর্ণনা অবিরাম বাক্যস্রোতের দীর্ঘ অনুচ্ছেদে (প্রতিটি কমপক্ষে ৪০ লাইন) যা স্পষ্টতই আধুনিক উপন্যাসের অন্তঃশীল স্বকথনের (interior monologue) রীতি অনুসারী। কথাসাহিত্যে এ রীতির প্রয়োগ একান্তভাবে অন্তর্জগতে। চেতনার স্তরকে একই সময়ে লিখিত রূপ দেওয়ার সুপ্রসিদ্ধ অসুবিধা

রাও প্রয়োগ করেছেন সম্পূর্ণ বহির্জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী উপস্থাপনে। ফলে বাস্তব বর্ণনা ঘনত্বর পরিবর্তে যে তরল স্রোতের আকার ধারণ করে পাঠকের মনে তার প্রতিক্রিয়ার দাগ একান্ত অস্পষ্ট। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: "And there was shuddered silence, like the silence of a jungle after the tiger has roared over the evening river, and then, like a jungle cry of crickets and frogs and hyenas and bison and jackals, we all groaned and shrieked and sobbed and we rushed this side to the canal bund and that side to the coconut-garden and this side to the sugar-cane field and that side to the Bel-field bund, and we fell and we rose, and we crouched and we rose, and we ducked beneath the rice harvests and we rose, and we fell over stones and we rose again, our field-bunds and garden-bunds did we rush, and the children held to our saris and some held to our breasts and the night-blind held to our hands; and could hear the splash of the canal water and the trundling of the guncarts, and from behind a tree or stone or bund, we could see before us, there, beneath the Bebbur Mound, the white city boys grouped like a plantain grove, and women round them and behind them, and the flag still flying over them···আমরা যদি পুরাণে, কি মহাকাব্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ শত্রুনিধন ইত্যাদি বর্ণনার কথা স্মরণ করি তাহলে পৌরাণিকতার দাবি আরও সংশয়ের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই বাক্যটিতে আখ্যায়ক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে নাটকীয়ভাবে অবিলম্বিত করায় প্রয়াসী—যা পৌরাণিক রীতিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রচয়িতার বিষয় বস্তু ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না তাই অনুভূতির তীব্র তাৎক্ষণিকতায় পাঠক অংশীদার নন। অর্থাৎ রচনাশৈলীতে এখানে ভারতীয় শিল্পীর মূল সমস্যার মুখোমুখী হই যেখানে তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন ধারারই উপযুক্ত পটভূমিতে নিজের শিকড় খুঁজে পান নি। সেইজন্যই তাঁর আত্মসমর্পণ বাস্তবের কাছে, ঘটনাবলীর নিরাকার স্রোতে।

ভাষার ব্যবহারে রাওয়ের শিল্পীসত্তার মূল্যায়ণের তীব্রতা যেন আরও বিশদভাবে পরিস্ফুট। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাওয়ের মত ভাষা ও আঙ্গিকে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যত্নবান শিল্পী দুর্লভ। ইংরিজী ভাষায় তিনি কন্নড় গ্রামীন জীবনের স্বাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দৈনন্দিন কথ্যভাষা থেকে প্রচুর অনুবাদ কাজে লাগিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কণেই এগুলির সার্থকতা এবং ইংরিজী যাদের মাতৃভাষা তাদের বাকরীতি অনুসারী নয় বরং সচেতন ব্যতিক্রম। এই সচেতনতাই প্রয়োগকে শিল্পসৌষ্ঠব দান করে কারণ প্রচলিত ভাষা থেকে বিচ্যুতি উপন্যাসটির সামগ্রিক গঠনের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যের সহায়ক। উপরন্তু অনুরূপ "বিশেষ" ভাষা ব্যবহার উপন্যাসের বাস্তববাদী রীতিতে সুপ্রচলিত যেখানে আমরা কথ্যভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা, এমন কি খিস্তিখাস্তা ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার চরিত্র ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে সঙ্গত মনে করি। যেহেতু রাওয়ের কথাশিল্প পুরান ও বাস্তববাদের সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী তাই সময় নির্ভর কথ্যভাষার সহজ সরল অন্তরঙ্গতার সংগে সময়োত্তীর্ণ সুদূরের ব্যঞ্জনা মেলাতে সচেষ্ট। এই মিলন সাধনাই শিল্পীর নিজস্ব কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা। প্রধানত ইংরিজী সাহিত্যের কাব্যধারা ও বাইবেলের চিরন্তন শৈলী থেকে আহরণ করে অলঙ্কারসমৃদ্ধ যে রচনারীতি আমরা কণ্ঠপুরে দেখি তার সরল বাহ্যিক রূপ যে লেখকের পরিশ্রমের ফলশ্রুতি তার যথেষ্ট প্রমাণ প্রারম্ভেই পাওয়া যায়ঃ

Our village—I don't think you have ever heard about it —Kanthapura is its name, and it is in the province of Kara.

High on the Ghats is it, high up the steep mountains that face the cool Arabian seas, up the malabar coast is it, up Mangalore and Puttar and many a centre of cardamon and coffee, rice, and sugarcane. Roads, narrow, dusty, rut-covered roads, wind through the forests of teak and of jack, of sandal and of sal, and hanging over bellowing garges and leaping over elephant-haunted valleys, they turn how to the left and how to the right and bring you through the Alamle and Champa and Mena and Kola palses into the great granaries of trade. There, on the blue waters, they say, our carted

cardamons and coffee get into the ships the Red-man bring, and, so they say, they go across the seven oceans into the countries where our rulers live.

এখানে আমরা দেখি কাব্যিক বাস্তবতার (poetic realism) সুষ্ঠ প্রয়োগ। ধ্বনি ও অর্থের বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহারে অনুচ্ছেদটি একটি রত্নখচিত শিল্প-কীর্তি। এখানে গতানুগতিক বাস্তব প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে দূরায়ত। আগে আমরা যে দীর্ঘ বাক্যটি তুলে দিয়েছিলাম, তাতে কিন্তু আমরা ভাষা-শৈলীর এই নিপুণতার বদলে পাই ভারসাম্যের অভাব। অর্থাৎ যেখানেই শিল্পী কলাশাস্ত্রের বন্ধনকে অতিক্রম করে নিছক অভিজ্ঞতার বাস্তবে আত্মসমর্পণ করেছেন সেখানেই তাঁর ভাষাশৈলী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। অসংখ্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাধারণ নিয়মানুগ (অর্থাৎ বিশেষ্য+ক্রিয়া) বাক্য সমষ্টির মধ্যে হঠাৎ একটি আলঙ্কারিক ব্যতিক্রম (ক্রিয়া+বিশেষ্য) বা অনর্গল বাক্যস্রোত একান্ত-ভাবেই খাপছাড়া। **"and the shets fall here and fall there, and in the darkness we can see a white group of men moving up, a white group of city boys, and behind the women the crowd again and the wounded shriek from this field and from that, voices of men and boys and old women, and above it all rises from the front ranks the song····.** এখানে শেষ লাইনটি বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ; ক্রিয়া বা বিধেয় (rises) এবং উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যর (the song) স্থান পরিবর্তনের ফল। অলঙ্কারের পরিশীলিত দূরত্ব এবং কথ্য ভাষার বিশেষ অন্তরঙ্গতা সবসময়ই পরস্পর বিরোধী নয়। ডিকেন্সে আমরা আঞ্চলিক উপভাষা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধু গদ্যরীতির চমৎকার সংমিশ্রণ পাই মেলভিলের Moby Dick এর মত মহৎ উপন্যাসে। কণ্ঠপুর উপন্যাস হিসাবে প্রধানত পরীক্ষামূলক। শিল্পকীর্তি হিসাবে বিশ্লেষণে এখানে আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলিকে দুটি বিপরীত গোষ্ঠীভুক্ত দেখি—একদিকে চিরন্তন হিন্দু মানসিকতা, পৌরাণিক ঢং-এর রেশ বজায় রাখার চেষ্টা, অলঙ্কারের কাব্যিক সুষমা ; অন্যদিকে বর্তমান ভারতীয় জীবনের বিশিষ্ট সমস্যা, বাস্তববাদ, কথ্য-ভাষার সংক্ষিপ্ত সহজ সরলতা। প্রথমটি যদি একটু কৃত্রিম, দ্বিতীয়টি বোধহয় একটু একঘেয়ে। দুটি গোষ্ঠী এত সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত যে সর্বাত্মক সমন্বয় সম্ভব হয় নি, সংঘর্ষের প্রবণতা তাকে পরিণত করে দুটি সমান অর্থবাহী স্বাধীন

উপাদানের সমষ্টি—যেন দ্বন্দ্ব সমাস।

আধুনিক ভারতীয় ঔপন্যাসিকের পক্ষে সাংস্কৃতিক জন্মস্থান খুঁজে পাওয়ার সমস্যা যে কত গভীর রাওয়ের অন্বেষণের তীব্রতাই তার প্রমাণ। তবে এ সমস্যা কি ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত? আধুনিক বাংলা কবিতা বা প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভাব, বিদেশী ভাবধারা অনুকরণের অভিযোগ কি সর্বৈব মিথ্যা? আসলে সমস্যাটা প্রত্যেক আধুনিক ভারতীয় লেখকের। উপযুক্ত পটভূমি ছাড়া সার্থক শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। পূর্বসূরীদের সঙ্গে মিল বা অমিল সব সময়ই সাহিত্যে বিশেষ প্রবাহের সৃষ্টি করে যার দ্বারা শিল্পীর ব্যক্তিগত কীর্তি তাৎপর্য লাভ করে। রাওয়ের সাহিত্যকীর্তির প্রথম পর্যায়ে পটভূমির অনিশ্চয়তা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্বে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কটেরই ইঙ্গিত।

কবিতাগুচ্ছ

রণজিৎ দাশের কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

রণজিৎ দাশ অসম্ভব ক্ষমতাবান কবি। কম বেশী বোধহয় দশ বছর ধরে তার কবিতা আমাদের চোখে পড়ছে। তবে তার কলমের ফসল এত কম যে ব্যবহারিক অর্থে যারা বাংলা কবিতার পাঠক, রণজিৎ-এর নাম তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে নাও আসতে পারে! মাঝে তিন চার বছর তিনি এতই কম লিখেছেন যে বাংলার অভ্যস্ত বহুপ্রসবিনী পরিবেশে তিনি প্রায় প্রবাসী হয়ে উঠছিলেন।

কিন্তু যারা একবার রণজিৎ দাশের কবিতা পড়েছেন তারা জেনে গেছেন কি অসম্ভব কব্জির জোর এই লাজুক খ্যাতি-উদাসীন কবিটির। সব কবিতাই যে প্রতিবার উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন এমন নয়। কিন্তু রচনাশৈলী, শব্দের বাঁধুনী ও উপস্থাপণকুশলতায় পাঠকের নজরে পড়বেই যে অতি সাধারণ এমন-কি আপাত-অসার্থক কবিতার শরীরেও কি অসম্ভব লাবণ্য আরোপ করতে পারেন তিনি। মূলত ছন্দমনস্ক ও বহমান বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত ধারার অন্তর্গত হয়েও তাঁর কবিতা প্রথম লাইন থেকেই নিজেকে আলাদা করে নেয়, যেন বা মাটির অনেকটা ওপরে স্পিলমটারের মতো ছিটকে ওঠে। যাকে বলে ঘাড় ধরে পড়িয়ে নেয়া, রণজিৎ-এর কবিতায় সেই অতিবিরল গুণটি বিদ্যমান।

রণজিৎ-এর প্রায় প্রতিটি কবিতা একটি তির্যক প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সংপৃক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু কবিতাটির প্রান্তে পৌঁছোনোর আগেই পাঠক দেখতে পান ঐ সব ভোম অলংকার খসে গিয়েছে, কবি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাভরণ প্রায় সন্ন্যাসীর মত সৎ হয়ে উঠেছেন। যে কোন খাঁটি কবিতার অন্যতম চরিত্র তো তাই-ই। এই সহজাত গুণ রণজিৎ-এর কবিতায় প্রথম থেকেই আছে। এর জন্য তাকে তেমন পরিশ্রম

করতে হয়নি। কিন্তু মনে হয়, এখন, এই উত্তর তিরিশ ও পূর্ব চল্লিশের মহার্ঘ সময়টুকুতে তাকে আরো অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে। উদাসীনতা ত্যাগ করে কবিতায় অর্থাৎ তার নিজের ক্ষমতায় আসক্ত হয়ে শুধু নয়, তাকে একটি অধিকতর প্রশস্ত রাস্তা বেছে নিতে হবে। সে রাস্তার অসম্ভব ভীড় ও অপ্রয়োজনীয় চীৎকারের মধ্যে তাকে কেমন দেখাবে এটা আমাদের অবিলম্বে যাচাই করা উচিত। দেখতে হবে সীমিত প্রকরণের গলিতে নয়, বক্তব্যের ব্যাপক ও প্রকাশ্য পথেও তিনি লক্ষ্যণীয় হয়ে হাঁটতে পারেন কিনা! এটাকে যেন রণজিৎ কমিটেড হবার উপদেশ বলে না ভাবেন! আমি কে যে উপদেশ দেব? আসলে এক-ধরণের শিকড়-আকড়ানো কমিটমেণ্ট না থাকলে তো কোনো শিল্পই শিল্পী-সার্থক হয়ে ওঠে না। রাজনীতি, সমাজ সচেতনতা, প্রেম, এগুলো সবই কবি ব্যক্তিত্বের অংশ, এদের যে কোন একটিকে বা সবকটিই কবি নিতে পারেন যেমন নিয়েছেন এই সংখ্যার মুদ্রিত লেখাগুলিতে, কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে যেন বোঝা যায় সময়ের কোন বিশেষ অংশটি অধিকার করে তিনি বেঁচে আছেন। কালচেতনা বললে ভারী শোনাবে। তা না বলে বলছি কবির দায়িত্ব তার দেশ, সমাজ, এমনকি তার প্রেমিকার কাছে (শুধু যৌনমনস্কতায় নয়!) মিলিত ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা।

অর্থাৎ রণজিৎকে এবার সার্চলাইটের নিচে এসে দাঁড়াতে হবে। যাতে তার সমস্ত কিছু আরো ভাল ভাবে লক্ষ্য করা যায়, খোঁজা যায়। কি অসম্ভব ক্ষমতা তার মধ্যে! এই অসম্ভব স্বাস্থ্যে তাঁর প্রতিটি মাংসপেশী আলাদা আলাদা করে এবং একসঙ্গেও চেনা যাক, সেই ব্যায়াম তাকে অবিলম্বে সুরু করতেই হবে।

রণজিৎ দাশের পাঁচটি কবিতা

আমার বাড়ি

আমার বাড়ির মাথায় সারাক্ষণ
একটি পতাকা অর্ধনমিত থাকে

এতে সুবিধে হয় পাখিদের, আমি দেখি,
খুঁটির ডগায় বসে তারা অবাধে ডানা ঝাপটায়, যার
দু'হাত নীচে ওড়ে ধারাবাহিক শোক

বেশ বাড়াবাড়ি এটা—ঢং :
রমণীদের মুখে এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে মনে হয়,
যে কোনো ক্ষীণ যৌননিঃশ্বাসের ধাক্কায়
একদিন এই বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

বিদ্রূপ এবং গাম্ভীর্যের এই মুখোমুখি নৈঃশব্দ্যের মধ্যে
কান পেতে জেগে থাকে আমার বাড়িটি, যার মাথায় প্রতিদিন

পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ বন্ধ হলে
বাতাসের সঙ্গে কালো লংক্লথের বিতর্ক শুরু হয়

বাবাকে

ভাতকাপড়ের দুশ্চিন্তা করেই
সমস্ত জীবনটা কাটলো আপনার।
কোনো শিল্প, কোনো সম্ভোগ, কোনো উদাসীনতা
আপনাকে স্পর্শ করলো না।

আপনার কথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।
আপনি আমার লেখার জগত থেকে একটু দূরে রয়েছেন,
যেমন শহর থেকে একটু দূরে থাকে পাওয়ার স্টেশন।

শহরতলি

ভারি মশারির নীচে শীত-গ্রীষ্ম, পুরসভা, খোলা লুঙ্গি আর টর্চলাইট—
এমন এক শহরতলিতে
পনেরো বছর পর আহত চোখ তুলে তাকাল একটি মেয়ে।
পুরুষটি অবাক হল। বুঝতে পারল না
পাখির বিষ্ঠা প'ড়ে প'ড়ে জমে-ওঠা ওই শাদা চাহনি। সে
মেয়েটির চিবুকে হাত রাখতে গিয়ে দেখল পেলভিস।

জাপটে ধরতে গিয়ে দেখল বাসের ভীড় এবং কণ্ডাকটারের চাপাহাসি।
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়ে দেখল অশোকস্তম্ভ এবং কুয়াশা, রক্ত।

পনেরো বছর পর, আবার শহরতলিতে অসন্তোষ শুরু হলো।

কৃষ্ণকীর্তন

যেন বক্তব্য ফুটে উঠলো এই সকালবেলার আলোয়। মানুষেরা
সেই বক্তব্য শুনতে পেলো এবং খুশি হলো ; আলোর মেজাজ বুঝে
হাত রাখলো গরু-মোষের পিঠে, বাসের হাতলে, স্বর্ণব্যবসায়ীর
দরজায়, বিদ্যুৎচুল্লীর সুইচে। যেন দহনের সূত্রে শুরু হলো জীবনধারা।
আমি—যে বহুদিন ধরে বুঝতে চাইছি মানুষের রাত করে বাড়ি ফেরার
সরলতা—আজ মোটের ওপর আশ্বস্ত হলাম। একটা মাছি উড়ে
এসে আমার পিঠে বসলো। ঘাম ফুটে উঠলো শরীরে। চমৎকার,
ভাবলাম আমি,
এই তো যোগাযোগ, আলোক-সংশ্লেষ, এভাবেই তবে গাছ বেড়ে ওঠে।
কিন্তু দেখলাম, বেলা গড়িয়ে যাবার আগেই মানুষ কিভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে
এই যোগাযোগ থেকে দূরে, সূর্যাস্তের ঝোপেঝাড়ে, সম্ভবত অন্ধকারের
বক্তব্য শুনতে। ফলে এবার আমি যা সোজাসুজি টের পেলাম, তা,
ইন্দ্রিয়দ্বিধা। আলো এবং অন্ধকারের এই গ্রীক ভূয়োদর্শনের মধ্যে
দাঁড়িয়ে, গঙ্গা, এবং যমুনার লেসবিয়ান মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে
আমার মনে হল, আত্মা-বিষয়ক ফুর্তিগুলো আমি একদম
ভুলে গেছি।

মিথুন পদাবলী

১.

কিশোরের মন থেকে তুলে আনি এক রতি নারী
যুবকের মন থেকে তুলে আনি অন্ধকার খাদ
গোপনে মেশাই, আর
বৃদ্ধের জীবন থেকে উঠে আসে চাপা আর্তনাদ

২.

হাতির দাঁতের মতো উরুদুটি জেগে আছে সবুজ চাদরে,
দরজা ভেজানো কি ? কর্ণেল শহরে গেছে ?
রামের বোতল আর আর্মি-ক্যাম্প থমথম করে

৩.

বালিতে ঘষেছো মুখ, গদাধর,
নুনছাল উঠেছিল ? জ্বালা করেছিল ?
ওই জ্বালা—কিশোরীর প্রথম আস্বাদ,—তুমি
পেয়েছিলে বালি থেকে। তৃপ্ত হয়েছিলে !

মৌলিক জিজ্ঞাসা

অনীশ দেব

ঘুম ভাঙার পরেও কিছুটা সময় নবীনবাবু আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। একট স্বপ্নের ঘোর কেটেও যেন কাটেনি। স্বপ্নে দেখলেন একটা চৌরাস্তার মোর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশে কিলবিল করছে মানুষ। খুব ব্যস্তভাব তারা যে-যার কাজে চলে যাচ্ছে, কেউ একবার ফিরেও তাঁর দিকে তাকাচ্ছে না। আর নবীনবাবু কেমন বোকা বোকা মুখে দাঁড়িয়ে সেই অচেনা জন-সমুদ্রের ব্যস্ততা দেখছেন।

কারো ধাক্কায় নবীনবাবুর তন্দ্রা কেটে গেল। মেয়েলি গলায় কেউ বললো ওঠো, চা হয়ে গেছে।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে চোখ খুললেন নবীনবাবু। নীল রঙের নাইলনের মশারি। তার ওপারে ঝাপসা একটা মুখ। মহিলার মুখ।

নবীনবাবু গায়ের লেপ সরালেন। হাই তুললেন। তারপর বার তিনেক ইষ্টনাম স্মরণ করে মাথার কাছে রাখা শালটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন। আলস্য-সূচক একটা শব্দ করে মশারির প্রান্ত তুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। তার পর আবার একটা হাই উঠলো। এবং বিছানার কিনারায় বসে পড়লেন নবীনবাবু।

নবীনবাবুর স্ত্রী ধূমায়িত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। বললেন, চটপট ধরো, ওদিকে উনুন বয়ে যাচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আয়েস করে প্রথম চুমুক দিলেন নবীনবাবু। চুমুক দেবার শব্দটা তার বেশ ভালো লাগলো। চায়ের স্বাদের জন্য স্ত্রীকে

অভিনন্দন জানালেন তিনি, দিন দিন তোমার হাত খুলছে। যদিও নবীনবাবু জানেন তাঁর স্ত্রী গত তিরিশ বছর ধরে তাঁকে একই স্বাদের চা খাওয়াচ্ছেন, এই শীতের সকালে বাহবাটুকু দিতে পেরে তাঁর ভালো লাগলো। হয়তো সেই সময়েই তাঁর প্রথম চোখ পড়েছিলো স্ত্রীর মুখের দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীনবাবু চমকে উঠলেন। প্রচণ্ড শব্দে বিষম খেলেন। চায়ের কাপ হাত থেকে পড়ে গেলো। কারণ চা যাঁর হাত থেকে তিনি নিয়েছেন তাঁকে তিনি চেনেন না।

আপনি কে?

সামান্য চা চলকে হাতে লেগেছিলো। সেটা পরনের লুঙ্গীতে মুছে কঠিন স্বরে জানতে চাইলেন নবীনবাবু।

গোলগাল মহিলাটি প্রথমটা অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা রসিকতা অনুমান করে হালকা গলায় বললেন, সাত সকালে আর ঢঙ কোরো না!

আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কে? নবীনবাবুর চোখেমুখে ঢঙ কিংবা ঠাট্টার লেশমাত্র নেই। কে এই মহিলা? কোন আত্মীয় কি? কিন্তু সব আত্মীয়কেই তো তিনি চেনেন!

লাল পেড়ে মহিলা এবার নবীনবাবুর কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। গোল-গোল চোখ দুটো আয়তনে যথাসম্ভব বড় করে গলা উঁচিয়ে বললেন, কি হলো কি তোমার? ইয়ার্কি করছো, না আমাকে আর পছন্দ হচ্ছে না?

আমতা আমতা করে নবীনবাবু বললেন, আমি—ইয়ে—সত্যিই আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনা—

গৃহিণী একটু ভয় পেলেন। স্বামীর চোখের কোন গোলমাল হয়নি তো? তাঁর চোখে মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠলো। গলা সামান্য নামিয়ে বললেন, আমি রমলা গো, রমলা।—তারপর গলা আরো নামিয়ে তোমার বিয়ে করা বউ!

নবীনবাবু রমলা নামটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মহিলার মুখমণ্ডল আর একবার পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর কোন ভুল হয়নি। তাঁর স্ত্রীর নাম রমলা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মহিলা কোনমতেই রমলা নন। অথচ মহিলার সরাসরি চাউনিতে নবীনবাবু কেমন যেন অস্বস্তি পাচ্ছেন। তিনি একবার আড়চোখে বাসি বিছানাটার দিকে দেখলেন। দু-জোড়া বালিশ পাশাপাশি। নবীনবাবুর পাশের বালিশজোড়ায়

রমলা শোয়। গত তিরিশ বছরে এ-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। গতকাল রাতেও তো, যতদূর মনে পড়ে, রমলাই শুয়েছিলো। কিন্তু সকালে এই অচেনা গিন্নী-গিন্নী মহিলাটি…

কাল রাতে আপনি কোথায় শুয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করেই নবীনবাবুর কেমন লজ্জা করলো। অথচ সত্যের খাতিরে উত্তরটা তাঁর জানা দরকার।

রমলা নামধারী মহিলাটি কিন্তু একটুও বিব্রত হলেন না। বললেন, ওই তো, ওখানে। তোমার পাশে। বালিশের তলায় হাতড়ে দেখো, আমার চুলের কাঁটা পাবে—

নবীনবাবু বালিশের তলায় হাত ঢোকালেন না। তিনি জানেন চুলের কাঁটা আছে। তাঁর স্ত্রী রমলা চুলের কাঁটা সঙ্গে নিয়ে শোয়। কিন্তু এতোগুলো প্রমাণ দাখিল করা সত্বেও নবীনবাবু নিজের বিশ্বাস—কিংবা অবিশ্বাস-থেকে টললেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন, ঠিক আছে, ন্যাকড়া দিয়ে এই ভাঙা কাপ প্লেট আর চা মুছে নিন—তারপর রমলাকে ডাকুন, আমি ডাকছি—

ব্যস্, রমলাদেবীর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিলো সেটুকুও নবীনবাবুর এই কথায় কেটে গেলো। তাঁর সন্দেহ রইলো না স্বামী, পাগল হয়ে গেছেন। তিনি হাঁসফাঁস করতে করতে অদূরেই একটি চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে সটান বসে পড়লেন। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

মহিলার এই আচরণে নবীনবাবু কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি তখন শোবার ঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখছেন। ঘরটা তাঁর চেনা তো?

অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর নবীনবাবু নিঃসংশয় হলেন যে ঘরটা তাঁর চেনা। এ-ঘরেই তিনি গত তিরিশ বছর বাস করছেন। কিন্তু রমলা গেলো কোথায়?

ইতিমধ্যে রমলাদেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন এবং উদ্‌ভ্রান্তভাবে দরজার কাছে গিয়ে কান্না মেশানো আতঙ্কিত গলায় ডাকতে শুরু করেছেন, রবীন, গোপাল, বুলা, শীগগীর আয়—শীগগীর আয় রে—তোদের বাবা কেমন করছেন—

বিছানায় নির্বিকার বসে থাকা নবীনবাবু লক্ষ্য করলেন ভদ্রমহিলা যে নামগুলো উচ্চারণ করছেন সেগুলো যথাক্রমে তাঁর বড় ছেলে, ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ের নাম! আশ্চর্য! ছেলেমেয়েদের ঠিক ঠিক নামগুলো পর্যন্ত জেনে নিয়েছে! কে এই নকল রমলা?

মায়ের দিশেহারা আকুল চিৎকারে ঘুম ঘুম চোখে তিনজনেই ছুটে এলো নবীনবাবুর ঘরে। নবীন, গোপাল ও বুলা। তার একটু পরেই এসে ঢুকলো নীরা—রবীনের বউ।

আগন্তুক চারজনকেই নবীনবাবু বেশ ভালো করে দেখলেন। চমৎকার! অভিনয়টা এরা দল বেঁধে বেশ ভালোই শুরু করেছে! কারণ নতুন চারজনের কাউকেই তিনি চেনেন না। 'চারজনের কাউকেই চেনেন না' কথাটা কি ঠিক হলো? কারণ তিনজনকে সম্পূর্ণ অচেনা ঠেকলেও শ্যামবর্ণ ছিপছিপে শান্ত অভিব্যক্তির মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে বুলার আদল যেন অনেকটা মেলে। আসলে এই অচেনা দঙ্গলের ভিড়ে সব কিছুই অচেনা ঠেকতে চায়। 'চেনা-অচেনা' এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও তাঁর মনে সংশয় তৈরী হয়েছে, কিন্তু এরকম আকস্মিক ধাক্কা আজ প্রথম।

কি হয়েছে মা? দুই ছেলে ও এক মেয়ের প্রশ্ন। নীরা চুপ করে দেখছে। শ্বাশুড়ীর সঙ্গে তার বেশি বনে না।

সকাল থেকে উঠে তোদের বাবা কিরকম যেন করছেন! চারজনকে কাছে পেয়ে রমলাদেবী যেন অনেকটা ভরসা পেয়েছেন। কোথা থেকে এক ঘর-মোছার ন্যাকড়া নিয়ে এসে চা, কাপ-প্লেটের টুকরো ইত্যাদি পরিষ্কার করে সরিয়ে নিলেন রমলাদেবী। তারপর একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে একবার স্বামীর দিকে, একবার ছেলেমেয়ে-বউমার দিকে দেখতে লাগলেন।

পরিস্থিতির দায়িত্ব নিলো রবীন। হাতের ইশারায় সবাইকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলে সে নবীনবাবুর কাছে এগিয়ে এলো।

তোমার কি হয়েছে, বাবা?

নবীনবাবু জানেন তাঁর বড় ছেলের নাম রবীন, সে ম্যাকিন্টশ্ বার্ন-এ চাকরি করে, বছর তিনেক আগে রবীনকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি, নীরা তাঁর পছন্দ করে আনা বউ-মা। কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়ানো বছর সাতাশ-আঠাশের এই যুবকটি কে? দিব্যি স্বচ্ছন্দে সে রবীন ও নীরা নামদুটি নিজে ও নিজের বউয়ের জন্য গ্রহণ করেছে!

নবীনবাবুর পুরু ঠোঁটে সবজান্তার এক-চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি রবীন নামধারী যুবককে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? বাবাকে চিনতে আপনার ভুল হয়নি তো?

অত্যন্ত সরল মনে নবীনবাবু প্রশ্নদুটি করলেও দ্বিতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা

রবীনের মুখে এক ঝলক রক্ত এসে গেলো।

রমলাদেবী মুখ নামিয়ে নিলেন। বললেন, সকাল থেকে আমাকেও চিনতে পারছেন না—

ছোট ছেলে গোপাল বললো, মা, সুধীরকাকাকে খবর দিই।

ডাঃ সুধীরশেখর পাল নবীনবাবুর বাল্যবন্ধু এবং তাঁর পারিবারিক ডাক্তার। নবীনবাবুদের লাগোয়া বাড়িটাই তাঁদের।

আমি খবর দিচ্ছি—বলে বুলা চলে গেলো ঘর ছেড়ে। রমলাদেবী বুঝলেন মেয়ে এ-ঘরে থাকতে অস্বস্তি পাচ্ছে।

রবীন ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। চোখে-কথার ধিক্কার ফুটিয়ে সে বললো, বাবা, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের সামনে কি ভাবে কথা বলছো তুমি?

নবীনবাবু ক্লান্ত স্বরে বললেন, ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি বলুন তো, রবীন-গোপাল-বুলা-নীরা—ওরা সব কোথায়? আর আপনারাই বা কোত্থেকে এলেন?

রাগে বিরক্তিতে রবীনের বলতে ইচ্ছে হলো, আমরা কোত্থেকে এসেছি সেটা তোমার চেয়ে আর কে ভালো জানে!—কিন্তু অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখে সে বললো, ভালো করে চেয়ে ছাখো। আমি তোমার বড় ছেলে রবীন।

নবীনবাবু মুখ নামিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে আড়চোখে রবীনের দিকে তাকান আর মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবখানা যেন, সব ধরে ফেলেছি চাঁদ! আমার সঙ্গে চালাকি?

এই বিদ্রূপের হাসি রবীনের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। হাত ছুঁড়ে, ডিসগাস্টিং। রাচী, রাচী! বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় দরজার কাছে হতবাক হয়ে দাঁড়ানো বউকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় বললো, তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কি? চলে এসো!

অতঃপর রমলাদেবী আবার কাঁদতে শুরু করলেন। নবীনবাবু তখন নিস্পৃহ চোখে উপস্থিত গোপাল নামধারী নব্য যুবকের দিকে তাকিয়ে। তাঁর ছোট ছেলে গোপাল ইকনমিক্স নিয়ে এম. এ. পড়ে। পড়াশোনায় ভালো। আবার একই সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। এই ছেলেটিও কি তাই?

গোপাল মা-কে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রমলাদেবীর কান্নার বেগ আস্তে আস্তে

স্তিমিত হয়ে এলো। গোপাল তখন এগিয়ে এলো বাবার কাছে।

বাবা, আমাদের কাউকে তুমি চিনতে পারছো না?

না, কাউকে না। আপনাকেও না।—নবীনবাবু মৃদু গলায় উচ্চারণ করলেন।

কখন থেকে তোমার এরকম হয়েছে?

আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বড়, আপনি করে কথা বললে খুশী হবো।—নবীনবাবু ছেলেটির আশোভন স্পর্ধা দেখে ধমক লাগালেন। প্রথমটা তিনি সম্বোধনটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। হাজার হোক, ওরা তো তাঁরই ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছে! কিন্তু আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।

গোপাল সামান্য থতমত খেয়ে গেছে বাবার ধমকে। এরপর কি করা উচিত সেটা ভেবে ওঠার আগেই ঘরে ঢুকলেন ডাঃ সুধীরশেখর পাল। সুধীরকাকা! বুলা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

নবীনবাবু লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। হাতে কালচে চামড়ার স্যুটকেশ। গলায় স্টেথো।

চোখে চশমা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল—তাঁরই মতো। আচার-আচরণে খুব স্বচ্ছন্দভাব—যেন এ-বাড়িতে কতোবার এসেছেন। কিন্তু নবীনবাবু এঁকে চেনেন না।

স্যুটকেশ ও স্টেথো একটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে ডাঃ সুধীরশেখর নবীনবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। গোপাল তাঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। ডাক্তারবাবু বসলেন। নবীনবাবু লক্ষ্য করলেন দরজার চৌকাঠে রবীন ও নীরা নামধারী দুটো মানুষ আবার এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অশেষ কৌতূহল। রমলাদেবী ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পিছনে থমথমে মুখে অপেক্ষা করছেন। চোখে কাতর দৃষ্টি। কান্না বেশি দূরে নেই।

ডাক্তারবাবু হাসলেন। বললেন, নব, এসব কি শুনছি?

নবীনবাবু গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, আপনি কাকে দেখতে এসেছেন?

'আপনি' সম্বোধনে সুধীরশেখর ঘাবড়ে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁরা পরস্পরকে 'তুই' বলেন। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে সুধীরশেখর বললেন, নব, তোর কি অ্যাম্‌নেশিয়া হয়েছে?

অ্যাম্‌নেশিয়া? নবীনবাবু অবাক হলেন। অ্যাম্‌নেশিয়ার স্মৃতি বিলোপ। না, স্মৃতিবিলোপ তাঁর হয়নি। হলে ছেলে-মেয়ে-বউ এদের সবার নামগুলো

তাঁর নির্ভুলভাবে মনে থাকবে কেমন করে? অথচ মনে হচ্ছে, এই ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁরই চিকিৎসা করতে এসেছেন।

নব, আমি সুধীর। তোর পাশের বাড়িতে থাকি। ডাক্তার।

মাথা ঝাঁকিয়ে তথ্যগুলো স্বীকার করলেন নবীনবাবু। অর্থাৎ, সুধীর নামে তাঁর এক বাল্যবন্ধু আছে। সে ডাক্তার এবং পাশের বাড়িলেই থাকে। তফাৎ শুধু, এই লোকটি সুধীর নয়।

মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

নবীনবাবুর স্পষ্ট জবাব শুনে রমলাদেবী ডুকরে উঠলেন। বুলার চোখ ছলছল করছে। ওর মুখের আদলটা কি আরও কিছুটা চেনা হয়ে যেতে চায়? দোটানায় পড়লেন নবীনবাবু।

নীরা ফিসফিস করে স্বামীকে বললো, বাবা অভিনয় করছেন না তো?

রবীনের আবার ধৈর্যচ্যুতি হলো। বললো, যদি অভিনয় হয় তাহলে মানতেই হবে বাবার কাছে অহীন চৌধুরী—শিশির ভাদুড়ীও শিশু। আমি চললাম, অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

হতবাক প্রাণীগুলোর সামনে বহুক্ষণ চেষ্টা চালালেন সুধীরশেখর, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে স্টেথোটা হাতে নিতেই নবীনবাবু বললেন, আর চেষ্টা করতে হবে না। ক' টাকা ফীস্, দিয়ে দিচ্ছি?

সশব্দে চেয়ার ঠেলে সুধীরশেখর উঠে দাঁড়ালেন। রমলাদেবীকে উদ্দেশ করে বললেন, বৌদি, আমি হার মানছি। ধীরেন গাঙ্গুলীকে খবর দিন। উনি এসবের চিকিৎসায় ধন্বন্তরী।

এমন সময় সদর দরজার কাছ থেকে কারো ডাক শোনা গেলো, বাবু আছেন নিকি?

আর কেউ তৎক্ষণাৎ চিনতে না পারলেও নবীনবাবু সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। খুশি খুশি মুখে বলে উঠলেন, আলম মিঞা! আসো, ভেতরে আসো।

ঘরে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে নবীনবাবুর দিকে তাকালো।

আলাম মিঞা দরজার চৌকাঠে এসে হাজির হলো। রোগা, চোয়াল ভাঙা, কালো চেহারা। পরণে ডুরে শার্ট আর একটা ময়লা পায়জামা। এয়ারপোর্টের চার নম্বর গেটের কাছাকাছি গৌরীপুর অঞ্চলে নবীনবাবুর ন' বিঘে জমি আছে। ভাগ চাষী হয়ে আলাম সে জমি চাষ করে। তবে নবীনবাবু কোন টাকা তার

কাছ থেকে নেন না। শুধু বলেন জমিটির দেখাশোনা করতে। কিন্তু আলম ছাড়েনি। শহরে এলে তরি-তরকারি, ডাল, সরষে—যখন যা পারে হাতে করে নিয়ে আসে। বলে, বাবু, চাষের পত্তন দিয়া চার গণ্ডার পরিবারডারে জীয়াইয়া রাখছেন, আপনের কর্জ কি এমতে শুধ্ হয়!

আজও তার হাতে এক বিশাল থলে। সেটা সে দরজার কাছে নামিয়ে রাখে। নবীনবাবুর কোন প্রতিবাদ শোনে না। তাছাড়া একঘর লোকের সামনে সে অস্বস্তি বোধ করে।

নবীনবাবু এতক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। পরিবার বলে দাবী করা মানুষগুলোকে অবাক করে দিয়ে আলমের কাছে এগিয়ে গেলেন। হেসে বললেন, বাড়ির খবর সব ভালো তো?

আজ্ঞে বাবু, আপনাদের আশীর্বাদ। তা আপনে জমিতে আইতাছেন কবে?

সামনের মঙ্গলবারে যাবো। চাষবাসের সবুজ খোলামেলা জমিতে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতে নবীনবাবুর ভালো লাগে।

বাবু, অহন আমি আসি। থলিখানা পরে নিয়া যামু। আলম মিঞা চলে গেলো।

নবীনবাবু লক্ষ্য করে বুঝলেন, রমলাদেবী, গোপাল, বুলা ও নীরা, চারজনেই খুব খুশী যে আলম মিঞাকে তিনি চিনতে পেরেছেন। কিন্তু রাগে অপমানে ডাক্তারসাহেবের মুখ জ্বলছে।

সুধীরশেখর বললেন, এতক্ষণ কি ন্যাকামি করছিলি? মানুষের বরদাস্ত করার একটা সীমা আছে।

ভদ্রভাবে কথা বলুন! ভুলে যাবেন না এটা আমার বাড়ি! কঠিনগলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে সুধীরশেখরকে স্তম্ভিত করে দিলেন নবীনবাবু। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা দশ টাকার নোট ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

নোটটিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করে স্টেথো ও সুটকেশ নিয়ে রাগী পা ফেলে সুধীরশেখর বেরিয়ে গেলেন। ঘরের পরিবেশ আবার আগের মতো ভয়াবহ হয়ে উঠলো।

রমলাদেবী, গোপাল, বুলা, নীরা, সবাইকে লক্ষ্য করে নবীনবাবু বললেন, আপনারা এবারে যেতে পারেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে খাঁটি মানুষগুলোকে পাঠিয়ে দিন।

বুলা চোখের জল মুছলো। নবীনবাবু কি ওকে ডেকে থাকতে বলবেন? রমলাদেবী দাঁতে অধর কামড়ে ধরলেন। গোপাল চিন্তায় বিমূঢ়। নীরার অস্বস্তি ও দুঃখ বেড়ে চলেছে। শ্বশুরকে তার খারাপ লাগতো না। ও মনে মনে ভাবলো, রবীনদের বংশে কেউ পাগল ছিলো না তো?

নবীনবাবু এখন সদর্পে ঘরে পায়চারি শুরু করলেন। চেনা। চেনা! ঘরের প্রতিটি জড় পদার্থ তাঁর চেনা! তিরিশ বছরের চেনা! কিন্তু··

হঠাৎ কি মনে হতেই টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ার থেকে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বের করলেন তিনি : একটা মরচে ধরা টিনের বাক্স খুলে নবীনবাবু তুলে নিলেন একটা চোট খাওয়া ক্ষুদে পুরনো হাত-আয়না। তাঁর তিরিশ বছরের সাথী। বেশ কয়েক সেকেণ্ড দেখবো কি দেখবো-না করে অবশেষে নবীনবাবু হাত-আয়নাটা তুলে ধরলেন নিজের মুখের সামনে। এই মুহূর্তে তিনি একান্তভাবে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে চান!

কবিতাগুচ্ছ

মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা

দীপক সেন

'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গোরিলাদের সমর্থন করি" —মনে পড়ে আবির্ভাবেই এই কবি আমাদের নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য করেছিলেন। কি অসম্ভব, প্রায় বাঘের মতো আগ্রাসী লাফ তার কবিতা "ওগো" "আমি" "তুমি"-র বিরক্তিকর মোহে ভরা বাংলা কবিতার ওপরে। প্রধানত পঞ্চাশ দশক, তারপর ষাট দশকের কিছু কিছু কবিতার পর বাংলা কবিতায় আর তেমন কিছু নতুন হচ্ছেনা যারা ধরে নিয়েছিলেন, তাদের গালে প্রায় থাপ্পড়ের মতো ধেয়ে এসেছিল মৃদুলের তীব্র কবিতার আক্রোশ। নাম ও লেখার মধ্যে এই মেরুপ্রমাণ ব্যবধান আমাদের আশ্চর্য করেছিল।

কিন্তু তারপর মৃদুল সত্যই মৃদু হতে থাকলেন। এবং ক্রমশ কালে ভদ্রে এখানে ওখানে শুধু তার কিঞ্চিৎকর লেখা নজরে আসতো। তিনি যে কবিতা থেকে অন্য কোথাও আগ্রহ স্থানান্তরিত করেছেন, লেখা পড়লেই বোঝা যেতো। একেবারে শুরুতেই পুরস্কার ও অত্যাধিক প্রশংসাই কি তার কারণ না অন্য যে কোনো বাঙালীর মতো জীবিকার অন্বেষণ তাকে অন্যমুখী করেছিল, তা নিয়ে ভাবা যায়, কিন্তু সঠিক কিছুই জানা যায়নি।

আমাদের আনন্দ, এ সংখ্যার কবিতাগুলিতে মৃদুল আবার প্রবলভাবে ফিরে এলেন। সেই আগেকার মতো বাঁকানো-ঘাড়, তেজী টাটকা এই কবিতাগুচ্ছে মৃদুল আরো পরিণত আরো গভীর হয়েছেন। প্রকাশভঙ্গীতেও নিজস্বতা ফুটে উঠেছে অনেক বেশী। বর্জিত হয়েছে বাহুল্য।

বিভাব সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একবার আমাকে বলেছিলেন দশ বছর না লক্ষ্য করে তিনি কোনো কবি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে ভয় পান। তিনি যা বলেছিলেন তাতে আমাদের সায় থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু এটাতো ঠিকই সত্তর দশক থেকে তেমন নতুন কোনো কবি আসছেন না, এটা যারা বলেন, তারা যে শেষ কথা বলার যোগ্যতা রাখেন এটা কোনো মতেই মানা যায় না। শুধু জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত বা "অন্নপূর্ণা ও শুভকালের" প্রায় অজানা অথচ প্রতিভাবান গৌতম বসু নয়, আরো অনেকেই আছেন ; যারা আসবেন তারা আসবেনই। মৃদুলের কবিতা আমাদের সেই আশাই জাগায়। নন্দনের সংবাদ যারা আনবেন তাদের হুর রে বলে স্বাগত সোল্লাস জানাতে হবে। আশীর্বাদের বয়সতো এরা প্রায় সকলেই পেরিয়ে গেছেন !

মৃদুল দাশগুপ্তের চারটি কবিতা

আলো

পতঙ্গ তৈরিই ; জ্বালো ; যতোটা ওপরে আজ ছুঁড়ে দাও
লুফে নেবো সামান্য আগুন,
গায়ে দাগ লাগবেনা, তাছাড়া বাতাস এখনও চোখের
জলে ভিজে আছে, হে ভাই গমের কুঁড়ো খুঁটে খুঁটে তুমি
এসো—গোয়ালের আগুন নেভাই

সাঁকো পেরোবার ছলে দেখি, তোমার ও মুখ দেখি, দেখি খিদে, উনুনের
ঘন ধোঁয়া নিচু হয়ে আজ চায় পোড়া খড় কুটোকেও জড়িয়ে
ধরতে, সঙ্গীদল এবার উল্লাস করো ; কার কেরোসিন ভাই ?
কার ভাত ? কার জমি ? কাদের ? কাদের ?

পথ জেলে দেওয়া ক্ষত দেখে কাঁদে যে ছেলে একাই—যদি তাকে
কাঁধে নাও, তবে হাত খালি বলে যাত্রীদলে মিশে যাবো
মাথার পালক পাতা, হাতে বুনো মহিষের শিঙা

গোলাঘরে পাখি বসিয়েছি, মনে বাসি ভালো, ও মা, সে তার সেতারখানি
যেতে গিয়ে কখনও আড়ালে বসে একটু শোনায় যদি
এই কাকতাড়ুয়ার ছেঁড়া ত্যানা ভোরবেলা ঝলমল করে

ঘোড়া

আয়না বসানো গতিপথে যে ছায়া দিনের একরোখা, বসাই নিজেকে পারি
যতোদিন, তুমি পারো ছোলা ও মটর দিতে ভাগ করে, এবং
আর কি পারো ? ও মুখ রাঙাই বলি অবাক বিহ্বল সেই
রাত্রির শাসনে মধুর···?

দাঁড়িয়ে ঘুমোনো এই পাহারা দিয়েছি এঁকে. নাও তুমি ধরে রাখো যখন
ঘুমোও যাতে সে জাগে দুঃখের দেশে, আর কুটো কুড়োতে কুড়োতে
রুখু হাতে তুলে নেয় যদিও মরচে ধরা সেদিন নোঙর

ঢুকে যায় লোহার আনন্দ সেই ধড়াচূড়ো মদ ও মুখোশ বাঘ
ফুটো করে মাল্লাদের জাগর তর্জনী গান চিমনির দশদিকে
মেষপালকের ঘামে দড়িছেঁড়া শিশিরকণার সেবা,
সেবার না থাকি যদি জানাই কুর্নিশ

পিঠ পেতে দিয়ে দেখি লোকালয়, রাত্তিরে দৌড়েছি জানো কতোদিন, ভিড় হয়ে
এলো শুনে ভোর হলো এখন পাতায় মুখে মুখ দিই···
দেখাও আমাকে আমি আরও আরও যাই···

ভাইসব

দিও না এমন হতে, যে—আমি তাকেই দেখি এমুখ ঘুরিয়ে কোণে প্রণাম
করার ছলে, সে কি আজও এতো কুঁড়ি অভিমানে অভিভাবকের
নিবিড় জঙ্গলে ওহো দেখে না আকাশ

চৌকিদার সামান্যই, গাছে আটকা কতো ঘুড়ি বিলিয়ে দিয়েছি, আমি
জুড়ি একোণ সেকোণ—রঙিন কাগজে তাপ্পি চোরা কাঠুরের
আঘাতে আঘাতে ক্ষত মহাশিরিষের গাঢ়
ক্ষমার স্নেহের আঠা লাগে

শুকনো দিনে যতো ঘুরি জড়ো করি কুটোকাটা, তোমাদের দিইনি কি ?
কখনও চুরির দায়ে পড়ি যদি—বাঁচিয়ো না, ঘুরে ঘুরে
জেনেছি নিশ্চিত হ্যাঁ হ্যাঁ ও দেখে আমাকে

যে টেবিল বানিয়েছো আমি তা দেখিনা, শুধু কাপের চায়ের শব্দে
আমারও ঠোঁটের ফুর্তি, বুনো গোঁফে কাঠ পিঁপড়ে, একদিন
টোকা দিয়ে ফেলে দেবে স্থির জানি সেই মেয়ে
এ-কারণ ঘোষণা করেছি আমি জয় তোমাদের

২০৭০

সংযোগ হারালে? ভয় শুধু এইটুকু, তেমন বইয়ের পোকা না হয়ে নিশ্চিত
জেনো তুমিও আমারই ছায়া, যদিও সুদূর কোনও উঁচু বাড়ি, অথবা
আকাশ খোলা, বৃষ্টি এলে গাছের নিচেই ঘর, আমরা দুজন
চেনা, ঠিকানা জানিনা ঠিকই—এতো যোগাযোগ

চিনিকলে লুটিয়ে পড়েছি, হাড়ের মড় মড় আমি রেখে দিই, আমি তো গানের
ভাষা তেমন বুঝিনা, জানো তুমি? তবে সেই ধ্বনিকে লাগাও কাজে
যদি থাকে সামান্য কাঁথাও—দাও পড়োশীর দুব্‌লা শিশুকে আর
গাও, দেখো শীতে কাঁপবে না, আমি মৃদু সম্পর্ক গড়েছি

সাইকেল উড়িয়ে যায় কারখানা ফুঁড়ে যে ও, না খেয়েই বিয়োনো বউয়ের পাশে
কতো কতো রাতজাগা বাপের গর্বিত মুখ, আমি ভাবি কি দেবে সে
সন্তানের মুখ দেখে, তাই এই চিরকুট তোমার বিশ্বাসে
থাকি সেদিনও এমনভাবে বেঁচে

মুছে দিলে পড়ো তুমি যতো দাগ ফাটা ক্ষয়া আমাদের জীবনে ঘটেছে
ঘটে; ঘটনাপ্রধান সেই বহমান নদীতীরে একদা আমারই ছবি
দাঁড়িয়ে তাকাও যদি মনে কি হবে না এই জল মাটি পুরুষ রমণী,
উৎপাদিত সমস্ত ফসল শস্য সব আমাদের?

গল্প

বিস্মরণ

সুধাংশু ঘোষ

সময়টা ভুলিনি। সেই যে কতকাল আগে একবার গিয়েছিলাম, সময়টা ঠিক মনে আছে। এই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম বিকেল চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে। এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময় বসে ছিলাম ট্রেনে। যেখানে গিয়েছিলাম সেই কতকাল আগে এবং যেখানে আরো একবার যাবার তীব্র বাসনা, তার কাছের স্টেশনে পৌঁছেছিলাম ছ'টা পাঁচ মিনিটে। সেই স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ। সেটা শীতকাল ছিল না। দুপুর গড়িয়ে যেতে না যেতেই বেলা ফুরিয়ে যায় নি। ছ'টা বেজে যাওয়ার পরেও শেষ বিকেলের ম্লান আলো ছিল, কেবল এলো মেলো হাওয়ায় এখানে-ওখানে ভাসছিল পাতলা অন্ধকারের আঁশ। হাড় কাঁপান শীত ছিল না, আবার ঝড়বৃষ্টি, প্যাচপেচে কাদার সময়ও ছিল না সেটা। নির্জন মেঠো পথ ধরে কেমন অবলীলায় হেঁটেছিলাম আধ ঘণ্টা। পথ অমন নির্জন হওয়ার কথা ছিল না। অন্তত একটি লোক সঙ্গী হতে পারত। আমি একা ওই স্টেশনে ট্রেন থেকে নামি নি। একটি লোক খুব তাড়াহুড়ো করে আমার ঠিক আগে ট্রেনের একই কামরা থেকে নেমেছিল ওই স্টেশনে। সেই লোকটি মেঠো পথে আমার সঙ্গী হতে পারত। হয় নি, কারণ সে বড় তাড়াতাড়ি আমার আগে আগে হেঁটে আর দেখতে না পাওয়ার দিকে চলে যায়। আমি তাকে আমার সামনের পথে আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম বড়জোর দু'তিন মিনিট।

এসবই মনে আছে।

ওই নির্জন পথের ধারে একটা বাছুর মুখ নামিয়ে ঘাস খাচ্ছিল। সে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল কয়েক মিনিটের। মুখ তুলে আমাকে দেখে সে দৌড় দিয়েছিল। দূরে যায় নি, পথের পাশেই খানিকটা জায়গার মধ্যে ঘুরেঘুরে লাফাচ্ছিল কিসের যেন আনন্দে। আকাশের দিকে লেজ তুলে সে আসলে আমাকে নাচ দেখাচ্ছিল। তার নাচ ধ্রুপদী ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। তবে তার গায়ের গাঢ় কমলা রঙের চিকন মখমল, তার শিঙবিহীন ছোট মাথার ঠিক নিচের একটা গোল দুধরঙ চিতি আমি মোটেই ভুলে যাই নি। খোলা আকাশের তলার মঞ্চে সেদিন সেই নৃত্যশিল্পীর একক অনুষ্ঠান দেখে ভারী মজা পেয়েছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে নদীর জল চোখে পড়েছিল। তখন রোদ্দুর ছিল না, মরা আলোটুকুও শুষে নিচ্ছিল গুড়ি মেরে এগিয়ে-আসা অন্ধকার, তাই চিকচিক করছিল না নদীর জল। ওই নদীর তীরে আমার মাত্র একচল্লিশ বছর বয়েসের মা'কে এক প্রখর দুপুরে পুড়িয়ে ছাই করেছিলাম। কড়া রোদ্দুরে আমকাঠের আগুনের জিভগুলো কী দারুণ নাচ দেখিয়েছিল সেদিন!

এসবই স্পষ্ট মনে আছে।

এক সপ্তাহ জ্বরে ভুগে একদিন আড়াই মাইল হেঁটে ইস্কুলে গিয়ে দেখেছিলাম ইস্কুল বন্ধ। আগের দিন বিশিষ্ট কেউ মারা গেছেন, তাই ছুটি। লাইব্রেরির দরজার পাশে কালো বোর্ডে নোটিশ সাঁটা দেখেছিলাম। গরম কাল। সকালের ইস্কুল। রাত থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ইস্কুলে পৌঁছেছিলাম ভোরবেলায়। ইস্কুলবাড়ির খোলা মাটির বারান্দায় কাদের যেন দুটো ছাগল শুয়েছিল। তারা নোংরা করে রেখেছিল বারান্দাটা। সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিতে পারি নি। আমার তখন নাকের ছায়ায় আর থুতনিতে সবে রেশমের রোঁয়া। ইস্কুল বাড়ির পেছনের বাগানে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে মাটিতে দাঁড়িয়েই কাঁচা গোলাপজাম ছিঁড়ে নিয়ে চিবোচ্ছিলাম। আমার কাছাকাছি বয়েসের একটি মেয়ে বাগানে এসেছিল ফুল তুলতে। গাছগাছালির আড়ালে অথচ কাছেই তাদের টিনের ঘর দেখতে পেয়েছিলাম। সে এগিয়ে এসে বলেছিল, আমি কাঁচা গোলাপজাম ছিঁড়ে খুব অন্যায় করছি। ঠিক তখন শুকনো পাতার ওপর খসখস শব্দ। সে চমকে উঠে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ায় তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখেছিলাম, দুহাত দূরেই একটা মস্ত গোখরোর উদ্যত ফণা। মুখ ঘুরিয়ে সেই স্থির উদ্যত ফণা দেখে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল। আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল সেই কাঁপুনি। এভাবে হয়ত পুরো এক

মিনিট। তারপর তিনি ফণা নামিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ভাঙা ইটকাঠের স্তূপের দিকে।

এসব ভুলিনি। ঠিকঠাক মনে আছে। মেয়েটির নখ বসে গিয়েছিল আমার কাঁধে। অনেকক্ষণ জ্বালা করেছিল। একটা দাগ ছিল কিছুদিন। সেই দাগ কবেই মিলিয়ে গেছে। সেই জ্বালা এখনো মাঝে মাঝে ঈষৎ মালুম হয়—এমন তাজ্জব কথা তো আর বলা যায় না। তবে অনেক পরে উন্তনে হাঁড়ি চাপানর তাগিদে বিদেশী সাহিত্যের মর্মে পৌঁছানর প্রয়োজনে যখনই বাইবেল নিয়ে বসেছি, তার জেনেসিস অংশ পড়তে গেলেই মনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে গোলাপজাম-গাছের তলার ওই দৃশ্যটা।

কুড়ি বছর বয়েস অব্দি নাকি যা কিছু দেখাশোনা। তারপর শুধু স্মৃতির ভার। শব্দের মালা কাঁধের ঝোলায় ভরে রেখেছি। সেই কতকাল আগে ওখানে একবার গিয়েছিলাম। আরো একবার যাবার তীব্র বাসনা। কিন্তু কেমন করে যাই? ওই জায়গার কাছের স্টেশনের নামটাই যে মনে পড়ে না। এখানকার স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে কোথায় গিয়ে নামব? ট্রেনে চেপে বসলাম, প্রত্যেক স্টেশনের নাম পড়তে পড়তে যাচ্ছি, যেই সেই স্টেশনে এল, নামটা লেখা আছে দেখেই আমার সব চড়াৎ করে মনে এসে গেল, চট করে নেমে পড়লাম—এমন হওয়ার আশা কম। ওটা খুবই খুদে স্টেশন। ওখানে একটা-দুটোর বেশি ট্রেন থামে না। ওখানে পৌঁছতে ঠিক কতক্ষণ লাগে তার হিসেব করাও সহজ নয়। অনেককাল আগে যখন একবার গিয়েছিলাম, তখন ছিল স্টিম ইঞ্জিন। এখন তো বিদ্যুতচালিত। ট্রেনের গতি বদলে গেছে। ওই স্টেশনের নামটাই বদলে গেছে কিনা তাইবা কে জানে। কারো মুখে শুনি না যে ওই ভুলে যাওয়া নাম!

ফুরসত পেলে মাঝে মাঝে বিকেলে বিকেলে এখানকার স্টেশনে চলে আসি। এটা জংশন স্টেশন। দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম। সেখানে ঘোরাঘুরি করি। যাত্রীদের কথা শুনি কান পেতে। যদি আচমকা কোনো সূত্র পেয়ে যাই—এই ছেলেমানুষি আশা।

আজ এখানকার স্টেশনে যাবার পথে একটা লোককে দেখলাম পেছন থেকে। দেখে চমকে উঠলাম। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। সন্দেহ হল, এই লোকটাই সেই কতকাল আগে ট্রেনের একই কামরা থেকে তাড়াহুড়ো করে ওই স্টেশনে নেমেছিল। হাঁটা পথে দুতিন মিনিট তাকে দেখেছিলাম আমার

সামনে খানিক তফাতে। তারপর সে জোর পায়ে হেঁটে আর দেখতে না পাওয়ার দিকে চলে যায়। আজো হয়ত লোকটা ওই স্টেশনে যাবে। ওর সঙ্গ নিলে পৌঁছে যাব আমিও। ওকে ধরা দরকার, অন্তত ওর সঙ্গে দুটো কথা বলা দরকার।

মানুষ এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে? আমি যত জোরেই পা চালাই, লোকটার সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়েই যাচ্ছিল। এখানকার স্টেশনে পৌঁছবার অল্প আগে একটু জায়গায় জল পেরোতে হয়। হয়ত মোটে গোড়ালি-ডোবা জল, কিন্তু তার তলায় পাঁক, প্রায় হাঁটু অব্দি ডুবে যায়। এত বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কেন যে ওখানে একটা সাঁকো বানায় না! ওই জলে জোঁক আছে আমি দেখেছি। ঝোপঝাড়ে যে ছিনে জোঁক থাকে তা নয়, জলের কালো লম্বা জোঁক। কেমন জেলির মতন, কিলবিল-কিলবিল করে, একবার গায়ে সেঁটে গেলে ছাড়ান মুশকিল। আমার যতটা ভয়, ঘেন্না তার থেকে বেশি। লোকটা কত সহজে সেই জল পার হয়ে গেল। আমি জলে নামতে হয়ত একটু দ্বিধা করেছিলাম অন্যান্য দিনের মতন। সেই ফাঁকে লোকটা স্টেশনঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

জল পার হয়ে এসে স্টেশন ঘরে, ওয়েটিং রুমে উঁকি দিলাম। কোথাও সে নেই। প্ল্যাটফর্মে লোকজনের পোশাক, অঙ্গের আদল, মুখ দেখলাম। তাকে পেলাম না। ঘন ঘন ট্রেন আসছে, চলে যাচ্ছে। এর মধ্যেই কি সে কোনো ট্রেনে উঠে সেই স্টেশনে অথবা অন্য কোথাও চলে গেল!

পনের মিনিট ছোটাছুটি করলাম প্ল্যাটফর্মে। কিছু কিছু অফিস ইতিমধ্যে ছুটি হয়ে গেছে বোধ হয়। প্লাটফর্মে, ট্রেনের কামরায় ভিড় বাড়ছে। পনের মিনিটে দুটো ট্রেন এসে থামল এই স্টেশনে। কথা বলা যায় এমন মানুষের মুখ জানলায় দেখলেই সেদিকে দৌড়ে গেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে চাইলাম, এই ট্রেন কি সেই স্টেশনে যাবে, সেই স্টেশনে থামবে? আমার কাছে খুব জরুরী প্রশ্ন। কিন্তু জানলায় বসা অথবা কামরার দরজায় দাঁড়ানো কাউকেই প্রশ্নটা করতে পারলাম না। কারণ সেই স্টেশনের নামটাই যে মনে পড়ল না।

কেন মনে পড়ে না? এ-প্রশ্নটা নিজেকে। এত চেনা, এত দিনের চেনা সেই স্টেশনের নামটা মনে পড়ে না কি তাকে ভুলে থাকতে চাই বলে, তাকে নিজের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলার মতন কষ্টে মন থেকে খারিজ করে দিতে চাই বলে? তাহলে আবার তাকে মনে আনবার জন্য, সেখানে যাবার জন্য এমন

উথাল-পাতাল অস্থিরতা কেন?

কিছুক্ষণ এখানকার স্টেশনে ট্রেনের আনাগোনা নেই। তার ফলে জোর ধাতব শব্দ কাটছে না, যেমন প্ল্যাটফর্মে লোকজনের চেঁচামেচি। বাচ্চাদের গলা, বড় মেয়ে-পুরুষের। কাছে-দূরে হলদেটে আলো, লাল আলো সবুজ আলো। এখানে-ওখানে ছড়ানো বোচকাবুচকি।

টিকিট কাউন্টারে লম্বা কিউ। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কী করব? কোন স্টেশনের টিকিট চাইব? কাউন্টারে পৌঁছে আবোলতাবোল বকলে পেছনের লোক আমাকে খ্যাপা ভেবে ঠেলে সরিয়ে দেবে।

অজগরের মতন কিউয়ের ধার ঘেঁষে কাউন্টারের কাছে চলে এলাম। আগেও অনেকবার এরকম করেছি। জানি কোনো লাভ নেই, তবু এগিয়ে এলাম। কাউন্টারের পাশে দেয়ালে সাঁটা কাঠের বিবর্ণ বোর্ডটায় এখান থেকে কোন ট্রেন কোন কোন স্টেশনে যায় তা লেখা আছে। স্টেশনগুলোর নাম প্রায় সবই মুছে গেছে। হলদেটে আলোয় মাত্র দুতিনটি নাম আন্দাজে পড়া যায় সেই নাম আমাকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয় না।

কাউন্টারের সামনে থেকে সরে আসতে আসতে আবার মনে হল, দেশ স্বাধীন হয়েছে কত বছর হয়ে গেল। কত নাম বদলে গেছে ইতিমধ্যে স্টেশনের নামটাও বদলে যায় নি তো?

কী করি, আজো ফিরে যাবো? এমন ফিরে ফিরে যাওয়া আরে কতকাল?

সত্যি ফিরেই যাচ্ছিলাম, নজরে পড়ল একটি চেনা লোক। আগে তো একে কোনোদিন এই স্টেশনে দেখি নি। জানি অবশ্য লোকটি ট্রেনে অফিস-বাড়ি করে। মেদের ভার নিয়ে লোকটি প্রায় ছুটে আসছিল, জেনে গেছে। আমার পাশ দিয়ে আমাকে দেখেও বোধ হয় না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল।

আমি পথ আটকে দাঁড়ালাম।—'মুকুন্দদা না?'

'হুঁ। তুই এখানে কী করছিস?'

'আমি তো প্রায়ই আসি এই স্টেশনে।'

'রেল স্টেশনে বেড়াতে আসিস!'

'তা বলতে পার। কিন্তু তোমার তো অন্য স্টেশন থেকে যাওয়া-আসা।'

'তা এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? এস না ওই স্টলে বসে একটু চা খাই। দুটো কথা বলি তোমার সঙ্গে।'

'আজ না রে ভাই। এখুনি একটা ট্রেন আছে। আমি সেটায় উঠবই।'

'এত তাড়া কিসের তোমার? না হয় এর পরের ট্রেনে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি একটা জিনিস জেনে নিতে চাই।'

'আজ হবে না। আমি তো এত আগে ফিরতে পারি না, দেরি হয়। আজ যখন সুযোগ পেয়ে গেছি, এই ট্রেনে ফিরবই।'

'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বউদিকে সারপ্রাইজ দেবে?'

'তা ঠিক নয়।'

'তবে?'

'হাতে সময় থাকলে তোকে গুছিয়ে বলতাম। তাহলে তুই এর মর্ম বুঝতে পারতিস। আমাকে তো দেখছিস, তোর বউদিও আমার মতন হয়ে গেছে। এই রকমই ঢিলেঢালা। তুই আগেকার দিনের আয়না দেখেছিস, যার পাতলা কাঠের ঢাকনার ওপর টিয়েপাখি, তলায় লেখা পতি পরম গুরু? সন্ধের মুখে তার বউদি সেই আয়না সামনে প্লেস করে মেঝেয় বসে চুল বাঁধে। চুলগুলি টানটান করে পেছন দিকে আঁচড়ায়। একটা কালো ফিতে দিয়ে মাথার পেছনটায় চুলের গোছা খুব এঁটে বাঁধে দুহাত দিয়ে। ফিতেটার এক প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকে। সেই সময়টায় তোর বউদিকে বেশ আঁটোসাটো লাগে। আমি সেই মুহূর্তে তাকে একটু দেখতে চাই।'

মুকুন্দদার ট্রেন এসে গেল। প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি, ঠেলাঠেলি। আমিও প্রায় ছুটছিলাম মুকুন্দদার পাশাপাশি। একটা কামরায় উঠতে পেরে মুকুন্দদা আবার বলল, 'তুই আমার কাছে কী জানতে চাস?'

কামরার দরজার সামনে লোকজনেরা ধাক্কা খেতে খেতে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি এই লাইনের সব স্টেশনের নাম আমাকে একে একে বলে যেতে পার?'

'আমি তো আমাদের স্টেশন অব্দি সব নাম পরপর জানি। তারপর আরো দুচারটে। আরো পরে কত স্টেশন আছে। আমার সব মনে থাকবে কেন? তোর স্টেশনের নামে কী দরকার?'

'না, এমনই।'

'ছিটেল হয়ে যাচ্ছিস নাকি?'

ট্রেন ছেড়ে দিল। মুকুন্দদার পানে দাগ ধরা দাঁত দেখা গেল আরো দুতিন সেকেণ্ড।

ফিরে আসছিলাম। কাদাজল পার হয়ে খানিকটা পথ এগিয়েছি, একটা

আউলবাউল গানের প্রথম কলি শুনতে পেলাম, খুব মৃদু। নিজেই গুনগুন করছি না তো? কানের ভেতরের পরিমিত বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছিল কয়েকটা কথা, 'ও পরানময়না রে, ক্যামনে ভুইল্যা থাকিস তারে?'

একদিন তো মনে পড়বেই সেই স্টেশনের নাম। যেতেই তো হবে ওই নদীর তীরে। তার জন্য অপেক্ষা আরো কতকাল?

★

বিভাব প্রকাশনীর বিশেষ উদ্যোগ

উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবির পেপারব্যাক চিত্রনাট্য সংকলন

১৯৮০-র স্বর্ণকমল প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র **"শোধ"** (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **"গরম ভাত"** গল্প অবলম্বনে)। দাম—সাত টাকা। চিত্রনাট্য—**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/বিপ্লব রায়চৌধুরী**/উপদেষ্টা—**বিজয় তেণ্ডুলকর**।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে স্বর্ণময়ূরে পুরস্কৃত **"আকালের সন্ধানে"** (অমলেন্দু চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে)। চিত্রনাট্য—**মৃণাল সেন** / দাম—আট টাকা ।

★

গল্প

কলকাতার কুয়াশায়

কিন্নর রায়

সকালের কুয়াশায় মোড়া কলকাতা দেখতে দেখতে উমানাথ সেন হাঁটছেন। এস এস কে এম হাসপাতালের, পাশ দিয়ে আসতে আসতে উমানাথ বুঝলেন শীত বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

ইনটেসটাইনাল ক্যানসার অপারেশনের পর এক বছর কেটে গেল। এখনও কেমোথেরাপি চলছে। দুবছরের কোর্স। এসব নিয়ে ডিটেল লিটারেচার দেখেছেন উমানাথ। ইনটেসটাইনের ক্যানসার খুব গোলমেলে। শতকরা ষাট জনের রেকারেন্স হয়। বাকি চল্লিশ ভাগ নিরাপদ। উমানাথ নিজেকে চল্লিশ জনের ভেতরেই ধরে রেখেছেন। ট্রিটমেন্টের কোর্স শেষ হওয়ার পর এক বছর বেঁচে থাকা। ব্যস।

এই তো অনাদিটা টুপ্ কোরে মরে গেল সেদিন। কলেজের পুরনো বন্ধু। অতবড় গাইনোকলজিস্ট। ছুটির দিনে সকালবেলায় চলে আসত। উমানাথ তখন চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। জুতো ছাড়তে ছাড়তে রান্নাঘরের দিকে হাঁক মারত—বৌদি এসে গেছি।

দুঘরের ফ্ল্যাটের শেষ ঘরে ঢুকেই আস্তে আস্তে জামা খুলত অনাদি। প্যান্টও। মাদুর বিছিয়ে উমানাথ। ওঁরই একটা ধুতি দুফেরতা কোরে পরে নিজেকে বিছিয়ে দিত মাদুরে। রাম এসে পা টিপত, গা ম্যাসাজ কোরত আস্তে আস্তে।

চান সেরে এসেছে একটু আগে। দাড়ি গোঁফ কামানো ঝলমলে মুখ।

মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে কাটা। কপালের ওপর পাকা চুলের ছোট ঢেউ—যেমন ইন্দিরা গান্ধীর, একটু পাশ ঘেঁষে।

ফরসা লাল টুকটুক ছোটখাটো চেহারা। মোরারজী দেশাইয়ের মতো কান। ক্লাসের পরীক্ষায় কোন দিন সেকেণ্ড হয়নি। ডাঃ রায়ের ছাত্র ছিলো অনাদি। শেষ রাতে উঠে পড়তে বোসে যেত। 'স্যার' বোলেছেন, সুতরাং কোরতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে উমানাথ তাঁর সাতাশ বছরের পুরনো ঘড়িতে সময় দেখলেন। পাঁচটা বেজে দুই। শীতের দিন নিয়ম কোরে সাত দিন অন্তর পাঁচ মিনিট স্লো হয়ে যায়। নিয়ম মতো নিশ্বাস ধরা-ছাড়া কোরতে কোরতে হাঁটতে লাগলেন। এটা একটা যৌগিক পদ্ধতি। হার্ট ভালো থাকে। তাঁর এমনিতেই শীত কম। স্টেটসম্যানে স্পেশ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করার সময় রাতে ফিরে চান কোরতেন। কি শীত, কি গরম। পেটে ছ/সাত পেগ রয়্যাল ট্রেজার থাকলে ভাবনা কি। এখন ড্রিংকস একেবারে বন্ধ। ঠিক ডাক্তারের বারণ নয় উমানাথ ভাবছেন, কি দরকার যাকগে।

খুব ইচ্ছে ছিলো রিটায়ারমেন্টের পর দেশে ফিরে আলু থেকে মদ তৈরা কোরবেন নিজের জন্যে। পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভদকা তৈরী হয় যেভাবে, তারই কোন একটা ফর্মুলা আনিয়ে নেবেন। তা আর হবেনা। দেশে দুরকম আলু হয়—জ্যোতি আর চন্দ্রমুখী—যে কোন একটা থেকেই করা যেত।

বেরনোর আগে ঘুমমাখা চোখে অঞ্জলি জোর কোরে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছে। তারওপর একটা খাদির হাল্কা লেডিজ চাদর। জমিতে ফুল-কল্কা আঁকা। গেল বছর অপারেশনের সময় কেনা।

চলতে চলতে একবার প্যান্টের ওপর দিয়ে কোলস্টমি ব্যাগ ছুঁয়ে দেখলেন উমানাথ। নাহ, ঠিকই আছে। ইদানীং এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসে চেয়ারে বোসে থাকলেও ছুঁয়ে দেখেন, ব্যাগটা স্টিকারের আঠা ছাড়িয়ে সরে গেল কি না। সারা দিনের জল জমা হয় ওখানে।

ইদানীং উমানাথকে আর পায়খানায় যেতে হয়না। কোন বেগের বালাই নেই। বাঁ দিকে কোলস্টমির গর্ত দিয়ে একটু একটু কোরে ময়লা এসে ব্যাগে জমে। দিনে একবার বদলে দেয়া, চানের পরে।

জার্মানি থেকে উমানাথের এক শালা ব্যাগ পাঠায়। বাই পোস্ট। রোজ

ব্যাগ বদলে দেয় অঞ্জলি। আর উমানাথ মাঝে মাঝেই তলপেটের বাঁ দিকে ব্যাগ ঠিক জায়গায় আছে কি না, অনুভব করার চেষ্টা করেন।

রেসকোর্স ছাড়িয়ে ভিক্টোরিয়া ডাইনে রেখে ময়দানে এসে পড়েছেন উমানাথ, কুয়াশা ভেদ কোরতে কোরতে। কোন মুড়িসুড়ি মানুষ দেখলে মনে হয় যেন জলের তলায় ডুবুরি। যেমনটি রঙিন ইংরেজী ছবিতে দেখা যায়। ভোরের প্রথম ট্রামেরা কপালে লাইট লাগিয়ে কুয়াশা সাঁতরে চলেছে। এদিক-ওদিক পাখির ডাক। পাতা পড়ার শব্দ।

সিগারেট ধরালেন উমানাথ। অঞ্জলি কাছে নেই, বকুনি খাবার ভয়ও নেই। আসলে বিপদের শতকরা চল্লিশ ভাগের মধ্যে বসে তিনি জীবনকে বড় মজার বলে নেন। এ গ্রেট ফান। কারুর সঙ্গেই আজকাল আর খারাপ ব্যবহার কোরতে ইচ্ছে হয়না। বাজে ব্যবহার করা মানুষটিকে মনে হয় পাগল। কবে আছি কবে নেই—এমনি এক সরু সুতোয় ঝোলা উমানাথ চার পাশের পৃথিবী, মানুষটানুষ বড় সোজা চোখে ছাখেন। একটা একটা কোরে বেশ কয়েকটা সিগারেট খাওয়া হয়ে যায়। পঞ্চান্ন বছরের উমানাথের মনে হয়, ধ্যুস, আর কটাই বা দিন।

ময়দানে রেলিংঘেরা পাকিস্তানী ট্যাংক কুয়াশা মেখে ডাইনোসরের বাচ্চা হয়ে বোসে আছে। টাটা সেণ্টারের পাশে এদিক সেদিক টুকরো আলোর পাড়। সূর্যের আলো ডানায় মেখে উড়ে গেল দু-চারটে পাখি। ভিক্টোরিয়ার কালো পরীর ডানায় আবছা ভোর। উমানাথের ধোঁয়া বিদায়ী কুয়াশায় মিশে গেল।

অনাদিকে ঘুগনি, শীতের দিনে কপির বড়া কোরে খাওয়াত অঞ্জলি। গরম গরম। কখনও ধোঁকার ডালনা, কড়াইশুঁটির কচুরি, মাছের চপ। তারপরেই চা। ভালো খাবার দেখতেন হাতফাত ধোয়ার বালাই ছিলো না অনাদির। খেতে খেতে কথা—যাই বলো তুমি উমা, পলিটিকসটা তুমি বোঝ না। ১৯৪৭/৪৮/৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারি উমানাথ এখনও দেশ-বিদেশের পলিটিকস খুঁটিয়ে পড়েন। তিনি যে কাগজের এডিটর, সেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর সপ্তাহে তিনটে ফিচার লেখেন। অনাদির কথা তাঁকে ভেতরে ভেতরে হাসায়। ওপরে গম্ভীর হন। কাগজে মুখ গুঁজে থাকেন।

এত ব্যস্ত ডাক্তার অনাদি যে, খবরের কাগজ পড়ারও সময় নেই। এর ওর মুখ থেকে যা কিছু শুনে নেন। এই তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যখন ক্যানডিডেট কে হবে, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে, তখন এরকমই এক

খাওয়াদাওয়ার সকালে অনাদি বলে বোসল, যাই বলো তুমি উমা, ওই চ্যাভানই ক্যাণ্ডিডেট হচ্ছে।

উমানাথ জানেন, এটাও অনাদি কারুর মুখেই শুনেছে। ওয়াই বি চ্যাবন, জৈল সিং, হীরেন মুখার্জির প্রসঙ্গ কাটিয়ে উমানাথ বেরতে পারেন না। কথার ফোকরে ইন্দিরা গান্ধী, মানেকা, ডাম্পি, জ্যোতি বসু, চন্দন বসুও ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে আর এক প্লেট ভাজা দিয়ে যায় অঞ্জলি। অনাদি হাঁ হাঁ কোরে উঠেও খেয়ে ফেলে। আবার চা চায়। উমানাথ শুধু চা।

এই অনাদি তাঁর ক্যানসার অপারেশানের সময় হাতে গ্লাভস, এ্যাপ্রন, মুখে কাপড়ের ফেটি পরে থিয়েটারে হাজির। রোজই প্রায় ঘুরে গ্যাছে। হঠাৎ সেরিব্রালে মারা গেল। শেষ দিন পনের ছিলো বেলভিউতে। চিনতে ফিনতে পারত না প্রায় কাউকেই।

মালফাল খেত না অনাদি, সিগারেটও না। শুধু টেনশনে টেনশনেই···। ওর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে নিজের নামে সংযোজন লিখেছিলেন উমানাথ। তাতে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তর্জনী উঠেছিল।

হাসপাতালে অনাদির মাথার ওপর একজনকে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সেন্টিমেণ্টাল ভালোমানুষ অনাদি তা সহ্য কোরতে পারেনি। কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

সিগারেট হাতেই পুড়েছে অনেকটা। এবার ফেরার পালা। চারপাশে কুয়াশার মশারি আবার কেউ যেন টাঙিয়ে দিল। সিগারেট ফেলে দিলেন।

উমানাথ ফিরছেন। প্রায় পৌনে ছটা।

হাল্কা কুয়াশামাখা মানুষটাকে চিনতে ভুল হলো না। সামনের চুল অনেকটা উঠে গ্যাছে। হাইনেক পুরো হাতা সোয়েটার, পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে কৃপাসিন্ধু বসু। উমানাথের সঙ্গে এক সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন করেছে। শেষ তিন বছর চাকরিও। আট মাস হলো রিটায়ারমেণ্ট হয়ে গ্যাছে। অবসরের একমাস বাদেই স্ট্রোক।

ময়দানে হাঁটছে কৃপাসিন্ধু। দূরে ওর সাদা ফিয়েট দাঁড়িয়ে, এটা না দেখেও বোলতে পারেন উমানাথ। উমানাথ যে কাগজের এডিটর, তার চিফ এ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার ছিলো কৃপাসিন্ধু। তার আগে এফ সি আই-এর পি আর ও। কাগজের অফিসে এসেই কৃপাসিন্ধু সবাইকে শোনাত, ব্যাঙ্কে তার তিনলাখ টাকা আছে।

কখনও ইউনিয়ন, কখনও বোর্ড, কখনও প্রেসঘর দিয়ে উমানাথকে নানারকম প্যাঁচ দেয়ার চেষ্টা কোরেছে কৃপাসিন্ধু। উমানাথ জানেন এখনও কৃপাসিন্ধু ছেড়ে আসা অফিস থেকে টেলিফোনে ওর গাড়ির জন্যে তেলের কুপন চায়।

রিটায়ারমেন্টের মাস দুয়েক আগে থেকে কৃপাসিন্ধু উমানাথের ঘরে আসত না। চার অক্ষরের একটা গালাগালি দিয়ে কাউকে কাউকে বোলত, কি টাইম আর নিউজ উইক দেখে দিনরাত টুকে টুকে লেখে উমাটা। ওসব কেউ পড়ে নাকি!

খবর পেয়ে উমানাথ হেসেছেন। বোলেছেন, ও পাগল আছে। স্ট্রোকের পর কৃপাসিন্ধুকে দেখতে গেছলেন বাড়িতে। তখনও ও বিছানায়।

কুয়াশার মশারি ছিঁড়ে উমানাথ কৃপাসিন্ধুর হাত ধরলেন। সামান্য চমক। তারপরই ঘুরে—কি মশাই, এখানে?

এক অফিসে আসার পর তুমি কেটে আপনি হয়ে গেছল। সম্পর্কও দূরের।

উমানাথ বোললেন, ঘুরছি! রোজই আসি।

—আমিও।

—শুনুন, এমনি হাঁটবেন না। দম ধরা ছাড়া অভ্যাস কোরতে কোরতে হেঁটে যান। হার্টের পক্ষে ভালো।

—সিগারেট খাচ্ছেন?

—বাড়িতে খাইনা। বাইরে খাই।

আমার বড় ভয় হয়। একটা স্ট্রোক হয়েছে। তাই আর—।

উমানাথ একটা সিগারেট ধরান। আলতো কোরে কৃপাসিন্ধুর কাঁধে হাত রাখেন।—চলুন আপনাকে গাড়ি অব্দি পৌঁছে দি।

—বেশ তো আপনাকেও নামিয়ে দেব এখন বাড়ির সামনে।

—নাহ্, আমার হাঁটা এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া একবার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেলে—।

কলকাতার কুয়াশা কাঁধে হাত রাখা দুজন পঞ্চাশ পেরুনো মানুষকে আড়াল কোরে নেয়।

প্রবন্ধ

জেলার সংবাদপত্র : কিছু তথ্য কিছু কথা

প্রদীপচন্দ্র বসু

১৭৮০ সালে জেমস অগাষ্টাস হিকি ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। হিকির এই কাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এর ষাট বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৪০ নাগাদ, তখনকার অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় বাংলায় প্রথম জেলার-সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাংলায় সংবাদপত্র কলকাতা থেকে অবশ্য এর আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মুর্শিদাবাদের দেখাদেখি পরবর্তী কালে অল্প সময়ের ব্যবধানে অন্যান্য জেলা থেকেও সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়। সেই থেকে অনেক বাধা বিঘ্ন, সময়ের অনেক কশাঘাত, সরকারী ও বেসরকারী অসহযোগিতা—সব কিছুকে অতিক্রম করে জেলার সংবাদপত্র প্রকাশ চলে আসছে। কখনো থেমে থাকেনি। একটি কাগজ কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, আর একটির জন্ম হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে সব মিলিয়ে পনেরো থেকে কুড়িটি কাগজ বের হয়। কোন কোন কাগজ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে একটানা প্রকাশিত হচ্ছে। সব কিছু বিশ্লেষণ করে এবং ক্ষতিয়ে দেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জেলার সংবাদপত্র প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের যে ঐতিহ্য আছে, ভারতের আর কোন রাজ্যে তা নেই। আমরা যাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বা 'যুগান্তর' বা অন্য কাগজ পড়ি, চায়ের টেবিলে 'দি ষ্টেটসম্যান' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' না পেলে অস্থির হয়ে যাই,

খুবই কম খবর রাখি জেলার সংবাদপত্র সম্পর্কে। মুষ্টিমেয় সংবাদপত্র পাঠক ছাড়া খুব কম পাঠকই জানেন বাংলাভাষায় প্রকাশিত জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য। এমনকি জেলার অধিবাসীরাও সেই জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে খুব উৎসাহ বোধ করেন না। কেন, সে আলোচনা পরে করবো। ফলে মুর্শিদাবাদের 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষি', নদীয়ার 'বার্তাবহ', কোচবিহারের 'ত্রিবৃত্ত' পুরুলিয়ার 'পুরুলিয়া গেজেট', বাঁকুড়ার 'বাঁকুড়া হিতৈষী', বীরভূমের 'চন্দ্রভাগা', পশ্চিম দিনাজপুরের 'বালুরঘাট বার্তা' প্রভৃতি জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি আজো সংবাদপত্র হিসাবে সেরকম উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। এদের প্রকাশের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলির অপরিসীম অধ্যবসায়, লড়াই করার ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের সদিচ্ছাই জেলার সংবাদপত্রগুলিকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রগুলি। এমনকি এই দুর্দিনেও অধিকাংশ জেলাতেই প্রতিবছর একটি-দুটি নতুন কাগজেরও জন্ম হচ্ছে।

প্রচার সংখ্যার তারতম্য অনুসারে সমস্ত সংবাদপত্রকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়। দশ হাজার পর্যন্ত প্রচার সংখ্যা হলে সেই সংবাদপত্র ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের আওতায় আসে। দশহাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে যেগুলি পড়ে তারা মাঝারি এবং পঞ্চাশ হাজারের ওপরে প্রচার সংখ্যা হলে বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিচারে সব জেলা সংবাদপত্রই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের আওতায় আসে। বর্তমানে অধিকাংশ জেলা থেকে প্রচারিত কাগজগুলির গড় প্রচার সংখ্যা দু'হাজারের বেশি নয়। কোন কাগজেরই প্রচার দশহাজার ছাড়ায় না এবং কোন সংবাদপত্রই পাঁচশোর কম ছাপা হয় না।

একথা বলা বাহুল্য যে জেলার সংবাদপত্রের প্রকাশস্থল হচ্ছে জেলা। জেলার সদরশহর, মহকুমা শহর বা অন্যকোন প্রধান শহর থেকে এগুলি প্রকাশিত হয়। পরিবেশিত সংবাদের মধ্যে অধিকাংশই থাকে যে জেলা থেকে প্রকাশিত সেই জেলার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে। প্রকাশের সময় বিচারে কোন জেলাতেই দৈনিক সংবাদপত্র নেই। কোনটি সাপ্তাহিক, আবার কোনটি পাক্ষিক। তবে সাপ্তাহিকের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য এই আলোচনায় আমি শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' এবং আসানসোল থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ'কে 'আজকাল'-কে জেলা সংবাদপত্রের আওতাভুক্ত করছি না। দৈনিক মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত হলেও এদের চরিত্র কলকাতার প্রধান বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্রগুলির অনুরূপ। জেলা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলির চরিত্রের সঙ্গে এদের চরিত্রে কোথাও মিল নেই। অন্যদিকে খানিকটা আঞ্চলিকতার ছোঁয়া আছে। আজকাল জেলার কাগজগুলির মধ্যে এক নতুন ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন কাগজ 'স্পেশালাইজেশনের' দিকে ঝুঁকছে বা এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন নদীয়া জেলার রানাঘাট থেকে প্রকাশিত 'সবুজ সোনা'। এই কাগজে শুধু কৃষি এবং কৃষির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ঘটনার খবর থাকে। পাঁচমিশেলী ঘটনার সংবাদ এই কাগজে পাওয়া যায় না। এরকম আরো দু'একটি কাগজ অন্য জেলা থেকেও প্রকাশিত হয় এক সুনির্দিষ্ট পাঠকের জন্য সেই পাঠকের জীবিকার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখেই এ-ধরণের কাগজের প্রকাশ। সবার জন্য নয়।

জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির চরিত্রের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে :

ক) প্রায় সব কাগজই হচ্ছে ট্যাবলয়েড সাইজের। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গড়ে যথাক্রমে আট সে. মি. ও পঁচিশ সে. মি.।

খ) পৃষ্ঠা সংখ্যা সব কাগজেরই চার।[১] কখনো কখনো ছয় পাতার কাগজও বের হয় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে।

গ) অধিকাংশ কাগজের দামই পনেরো থেকে তিরিশ পয়সার মধ্যে থাকে।

ঘ) সব কাগজই লেটার প্রেস পদ্ধতিতে ছাপা হয়।

ঙ) শতকরা পঞ্চাশভাগেরও বেশি কাগজের মালিক নিজের ছাপাখানায় কাগজ ছাপেন।

চ) অধিকাংশ কাগজের যিনি মালিক তিনিই সম্পাদক, সংবাদদাতা, সংবাদ সংগ্রাহক, প্রুফ রীডার, প্রকাশক এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক। প্রয়োজন হলে আয়ব্যায়ের হিসাব, নিউজপ্রিন্ট কেনাকাটা সবই তাকে করতে হয়।

ছ) সংবাদপত্র প্রকাশের আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে আথিক কারণে অধিকাংশ মালিক তথা সম্পাদক অনুসরণ করন না। পাতা সাজানো বা ছাপার টাইপ নির্বাচন, যা অনেক সময় বাড়তি পয়সা খরচ না করেও অদলবদল সম্ভব এবং পরিবর্তন করলে উৎকর্ষতাও বাড়ায়, স্রেফ গাফিলতি বা অজ্ঞতাবশত করা হয় না।

জ) ছাপার কাজে প্রধানত দশ বা বারো পয়েন্টের প্রচলিত পাইকা টাইপ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন কাগজ আবার বারো পয়েন্টের মনোফেস টাইপও ব্যবহার করে। হেডলাইন ছাপতে ব্যবহার করা হয় চোদ্দ থেকে তিরিশ পয়েন্টের বোল্ড টাইপ।

ঝ) ধরতে গেলে কোন কাগজই ছবি ছাপে না সংবাদের সঙ্গে। কখনো সখনো দু-একটা কাগজ কলকাতা থেকে ছবির ব্লক করিয়ে নিয়ে ছাপে যা চোখে পড়ার মত নয়।

ঞ) অধিকাংশ কাগজেই ছাপার ভুল সহজে নজর কেড়ে নেয়।

জেলার সংবাদপত্রের ওপরে লেখা চরিত্রগুলি হচ্ছে বাইরের চরিত্র যা এক-দৃষ্টিতে পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারেন কাগজে চোখ বুলিয়ে। এ পর্যায়ে আরো একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞাপন। হ্যাঁ, কলকাতা বা মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত দৈনিকের মত জেলার সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করেই এই কাগজগুলি কিছুটা বেঁচে আছে। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মধ্যে জেলার কাগজে অধিকাংশই হচ্ছে 'ক্লাসিফায়েড এডভারটাইজমেণ্ট' এবং কোর্ট ও টেণ্ডার নোটিস', ডিএভিপি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বড় বড় ভোগ্যপণ্য উৎপাদক সংস্থার বিজ্ঞাপন মোটামুটি পায় এরকম জেলার কাগজ খুব কমই আছে। তবে আজকাল সার, কীটনাশক ওষুধ ও কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনও বিক্রয়ের সংস্থাগুলি জেলার সংবাদপত্রগুলিতে বেশ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এসব বিজ্ঞাপন যতই পাওয়া যাক না কেন, জেলার কাগজ প্রধানত বেঁচে আছে স্থানীয় দোকানদারদের দেওয়া ছোট ছোট ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের ওপর।

গড় হিসাব ধরলে অধিকাংশ কাগজ প্রতি সংখ্যায় মোটামুটি ষাট কলাম-সেণ্টিমিটার বিজ্ঞাপন পায়। খুব কম কাগজের ভাগ্যেই জোটে একশো কুড়ি বা একশো পঁচিশ কলাম সেণ্টিমিটার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের হার কাগজগুলিতে সাধারণত প্রতি কলম-সেণ্টিমিটার পিছু তিন থেকে চার টাকা হয়। সুতরাং ষাট কলাম সেণ্টিমিটার বিজ্ঞাপন গড়ে পেলে একটি কাগজ প্রতি সংখ্যায় আয় করে একশো আশি থেকে দুশো চল্লিশ টাকা। এ দিয়ে কি কাগজ চলে? অন্য দিকে কাগজ বিক্রী করে যে টাকা আসে তার বেশ কিছু অংশ ডাক খরচ করতে যায়। কারণ জেলার সংবাদপত্রের গ্রাহক থাকেন সারা জেলায় ছড়িয়ে দূরদূরান্তের গ্রামেগঞ্জে। হকার দিয়ে সাইকেলে কাগজ বিলি সম্ভব নয়। সুতরাং পোষ্ট অফিসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি থাকে না প্রকাশকের।

ছাপা, নিউজপ্রিণ্ট, পোষ্টেজ—সব মিলিয়ে একটি জেলার সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যা প্রকাশে যা খরচ হয়, আর বিজ্ঞাপন ও কাগজ বিক্রী থেকে যে পয়সা ঘরে আসে, যোগ বিয়োগ করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ কাগজ কখনোই লাভের মুখ দেখতে পায় না। দু-একটা কাগজ হয়ত নিজস্ব যোগাযোগের দৌলতে বিভিন্ন সংস্থা থেকে বেশি পরিমাণে বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে সমর্থ হয় এবং সেগুলির মালিকরা হয়ত কিছু লাভ করেন। তাও অবস্থা যে সবসময় সমান যায় তা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জেলার সংবাদপত্রগুলি তাহলে কি কারণে প্রকাশ করা হয়? নিছক জনসেবাই কি এর লক্ষ্য? নাকি ঘরের পয়সা খরচ করে বনের মোষ তাড়ানোর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

১৮৪০-এ প্রকাশিত প্রথম জেলা-সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সংবাদ পত্র' প্রকাশের পেছনে উৎসাহ ও সহায়তা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন অন্যতম রাজা কৃষ্ণনাথের। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রথম থেকেই প্রতিটি জেলার সব কটি কাগজ প্রকাশের পেছনেই এ-ধরণের কোন না কোন অর্থবান প্রভাবশালী ব্যক্তির সরাসরি বা অপ্রত্যক্ষ সহায়তা আছে। অবশ্য খোঁজ করলে দেখা যাবে যে দু-চারটি কাগজ এমন সব ব্যক্তির চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে যাঁদের পয়সা নষ্ট করার মত বাড়তি সামর্থ্য ছিল না। এক্ষেত্রে নাম করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে বিখ্যাত দাদাঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কাগজ 'জঙ্গীপুর সংবাদ'। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই দাদাঠাকুর এই কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। সমাজ সেবা এবং নিজের বিশেষ চিন্তাভাবনাকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যেই ছিল তাঁর এই প্রচেষ্টা। সমীক্ষা করে আমি যা দেখেছি কোন বিশেষ এলাকায় সংবাদ সরবরাহের জন্য বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য বা কোন অর্থবান ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—একটি জেলা-সংবাদ পত্র আত্মপ্রকাশের পেছনে কাজ করে। ব্যবসা করার জন্য কাগজ বের করা বোধহয় কারুরই উদ্দেশ্য থাকে না। তবে সব প্রকাশকই চান, লাভ না হোক লোকসান যেন না হয়।

লাভ লোকসানের প্রশ্নে আর একটা কথা বলার আছে। ভোগ্য পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতাদের কাছে জেলার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কখনোই খুব লাভজনক হয় না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ধরা যাক কোন এক সংস্থা পনেরোটি জেলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। প্রতিটি সংবাদপত্রে ষাট-কলাম সেণ্টিমিটার জুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তাহলে পনেরোটি কাগজে মোট

ন'শো কলাম সেন্টিমিটার জায়গায় প্রকাশিত হল বিজ্ঞাপনটি। প্রতি কলাম সেন্টিমিটারের দাম তিন টাকা ধরলে এই বিজ্ঞাপন দিতে খরচ হল সাতাশশো টাকা। এখন কলকাতার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিলে ষাট কলাম সেন্টিমিটারের জন্য খরচ পড়বে খুব বেশি হলে দু'হাজার টাকা। কলকাতার কাগজটির প্রচারসংখ্যা যদি গড়ে চার লক্ষ হয়, তার অন্তত এক লক্ষ কপি জেলায় বিক্রী হয়। অন্যদিকে প্রতিটি কাগজের গড় দু'হাজার প্রচার সংখ্যা ধরলে পনেরোটি জেলার কাগজের মাধ্যমে ওই সংস্থা তিরিশ হাজার পাঠকের কাছে পৌছুতে পারছেন। এক্ষেত্রে আরো একটা জিনিষ ভাবার আছে। জেলার সংবাদপত্র যাঁরা পড়েন, কলকাতার দৈনিক কাগজগুলিও তাঁদের অধিকাংশই পড়ে থাকেন। কারণ সংবাদপত্রের পাঠকের ক্ষুধা একটা ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র কখনোই মেটাতে পারে না। সুতরাং একই পাঠকের কাছে বার্তা পৌছে দিতে প্রতিষ্ঠিত দৈনিকের সঙ্গে আবার জেলার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বিজ্ঞাপনদাতারা খুব আগ্রহী বোধ করেন না। সরকারী বিজ্ঞাপনের কথা অবশ্য আলাদা। অনেক উদ্দেশ্য নিয়েই সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষ বার্তাটির পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া ছাড়াও, জেলার সংবাদপত্রগুলিকে আর্থিক সহায়তা দানও সরকারী বিজ্ঞাপন প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাইজ, দাম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, ছাপার গুণাগুণ বা বিজ্ঞাপনই একটা সংবাদপত্রের সব নয়। পরিবেশিত সংবাদ এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুই সংবাপত্রের আসল চরিত্র নির্ধারণ করে। এর ওপরই নির্ভর করে প্রকাশকের সাফল্য ও পাঠকের আনুকূল্য। পাঠক যা চান, সংবাদপত্র তা না দিতে পারলে সংখ্যা বাড়ানো এবং পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। এক অর্থে জেলার সংবাদপত্রগুলি 'কমিউনিটি নিউজপেপার'। যে জেলা থেকে যে কাগজ প্রকাশিত হয়, সেই জেলাবাসীদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে রেখেই পরিবেশিত সংবাদ নির্বাচন করেন সম্পাদকরা। অনেক সময় পুরো জেলাও নয়, শুধু মহকুমার ঘটনাগুলিই সংবাদ নির্বাচনে প্রাধান্য পায় যদি কাগজটি প্রকাশিত হয় কোন মহকুমার শহর থেকে। দৈনিক পত্রিকার মত সারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোন জেলার কাগজেই থাকে না। এরকম বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও কোন জেলার সংবাদপত্রের নেই। আগেই লিখেছি অধিকাংশ জেলার কাগজের যিনি সম্পাদক তিনিই সংবাদদাতা। খবর সংগ্রহ করার সূত্রও হাতে গোণা। জেলা সমাহর্তা

বা মহকুমা শাসকের অফিস, এস পির দপ্তর, সরকারী অফিস, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা, রেডিও মারফত পরিবেশিত সংবাদ, জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে লেখা পাঠকের চিঠিই সংবাদ সংগ্রহের প্রধান ভরসা। এছাড়া জেলার সদর শহরের প্রেস ক্লাব ও সরকারী প্রচার দপ্তরের মাধ্যমেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরেও সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

জেলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ষাট থেকে সত্তর শতাংশ জুড়ে থাকে অপরাধ এবং রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ। এরপর আসে সরকারী কাজকর্মের কথা। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের খবর খুব কম জায়গা পায়। পরিবেশিত সংবাদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরা এবং জনজীবনের মান উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে জেলার সংবাদপত্রগুলি খুব গুরুত্ব সহকারে ছেপে থাকেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনার সংবাদ কোন কোন জেলার কাগজ কখনো সখনো ছাপেন। এর মধ্যে সাধারণত আসে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বা মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু ইত্যাদি। সংবাদপত্র বিজ্ঞানের ভাষায় জেলার সংবাদপত্রগুলি 'সফ্‌ট নিউজ' অপেক্ষা হার্ড নিউজ ষ্টোরি' ছাপায় বেশি আগ্রহী। সংবাদ ছাড়াও কোন কোন জেলার কাগজে গল্প কবিতাও ছাপা হয়। তবে সেগুলি মূলতঃ স্থানীয় প্রতিভাকে উৎসাহ দানের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তার ফল খুব ভালও হয়।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছাপার পেছনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রায় সবকটি জেলার সংবাদপত্রেরই ঝোঁক আছে। একই জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, দুর্ঘটনা, ডাকাতি, রাজনৈতিক মারামারি—জেলার সংবাদপত্র খুললে পাঠকের নজরে এগুলিই প্রথমে আসে। বড় বড় হেডলাইন দিয়ে কাগজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসব খবর ছাপা হয়। কোন কোন সংবাদ পত্র আবার খুন এবং ধর্ষণের খবরগুলি এত বিশদভাবে ছাপেন যে পড়লেই শিহরণ জাগে। এ ধরণের সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র জগতের ভাষায় যাকে বলে 'ইয়েলো জার্নালিজম', জেলার সংবাদপত্র খুললে আকছার দেখা যায়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনে কাগজগুলির পক্ষপাতিত্ব। এক একটি কাগজের দুর্বলতা থাকে এক একটি রাজনৈতিক দল বা মতবাদের প্রতি। মালিক বা সম্পাদকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রতিচ্ছবি খুব স্পষ্টভাবে ধরা যায় রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের ধরণ দেখে

এর ফলে অধিকাংশ জেলার কাগজ রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমানভাবে গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে না।

কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং ছোটখাটো ব্যবসাই হচ্ছে গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা। সুস্থ চোখে দেখলে এই জীবিকার সঙ্গে জড়িত সংবাদই জেলার কাগজে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় তা থাকে না। বন্যা বা খরা যখন চাঞ্চল্যকর রূপ নিয়ে দেখা দেয়, সরাসরি আঘাত করে জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামোতে, জেলার কাগজের সম্পাদকরা তখনই একে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন। অন্যথায় রাজনীতি ও অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদই প্রথম পাতা জুড়ে থাকে। শুনতে খারাপ লাগলেও একথা বলা যায় যে গ্রামের দিকে প্রতিবাদী মানুষের সংখ্যা কম। কিন্তু জেলার সংবাদপত্রগুলি সংবাদ পরিবেশনে বুদ্ধিজীবিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কৃষি মজুরদের দুঃখদুর্দশার চেয়ে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট জেলার কাগজের সম্পাদকের কাছে অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্যএর পেছনে একটি বিশেষ কারণও কাজ করে। আর তা হচ্ছে পত্রিকার পাঠককে গুরুত্ব দেওয়া। একথা ঠিক কৃষিমজুরের চেয়ে শিক্ষকরাই কাগজ বেশি পড়েন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত যেসব লেখায় সম্পাদক বা লেখকদের মতামত প্রতিফলিত হয় যেমন সম্পাদকীয়, সমালোচনা, আলোচনা প্রভৃতি জেলার কাগজে নিয়মিত থাকে না। একমাত্র সম্পাদকীয়ই নিয়মিত ছাপা হয়। সম্পাদকের দপ্তরে পাঠকের যেসব চিঠি আসে তাও প্রতি সংখ্যায় ছাপা হয় না। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি প্রধানত হয় সমালোচনা মুখর। কখনো সখনো গল্প বা কবিতা এইসব কাগজে ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে বলি, প্রত্যেক জেলায় বেশ কিছু পরিচিত কবি ও কথা সাহিত্যিক আছেন যাঁদের লেখা আমরা কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং জেলা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনে পড়ি। কিন্তু জেলার নিজস্ব সংবাদপত্রে এঁদের লেখা কখনোই দেখা যায় না। (আরেকটি কথাও এখানেই জানিয়ে রাখা ভাল যে আমাদের সমীক্ষা শুধুমাত্র জেলার সংবাদপত্রের ওপর, জেলার সাহিত্যের লিটল ম্যাগাজীন-গুলোর উপর নয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির মূলে জেলার সাহিত্যের কাগজ-গুলির অবদান অপরিসীম)। একটি ঘটনা সম্পর্কে যেমন তথ্য সংগ্রহ হয়, ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে তা ছাপা হয়। আর যিনি সংবাদিক তিনিই সম্পাদক হওয়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পাদনার কোন সুযোগ থাকে না।

এবার আসা যাক জেলার সংবাদ পত্রের পাঠক প্রসঙ্গে। কারণ সংবাদপত্র পাঠকদের জন্য ছাপা হয়। পাঠকদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে রেখেই সংবাদপত্রের সম্পাদকরা পত্রিকাকে সাজান। সুতরাং পাঠকদের চরিত্র ও চাহিদা অনেকাংশে সংবাদপত্রের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে পেশা নির্বিশেষে সব ধরণের পাঠকই আছেন যাঁরা জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পড়ে থাকেন। সরকারী কর্মচারী, কৃষক, স্কুলশিক্ষক, ব্যবসায়ী, বাড়ির গৃহিণী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সবাই আছেন পাঠকবর্গের মধ্যে। প্রধানত জেলার খবরাখবর জানার জন্যেই এঁরা জেলা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলি পড়ে থাকেন। জেলার কাগজে তাঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খবরাখবর আশা করেন না। যাঁরা জেলার কাগজ পড়েন তাঁদের প্রায় সবাই কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়েন। কলকাতার দৈনিক কাগজগুলি এঁদের কাছে জেলার কাগজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই সব পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে জেলার সংবাদ পত্রের কাছে তাঁরা যা যা আশা করেন কখনোই তা পান না। একথা যদিও ঠিক যে একটি সংবাদপত্র সব ধরণের পাঠককে তৃপ্ত করার মত সংবাদ কখনোই পরিবেশন করতে পারে না, আবার একথাও ঠিক যে পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টায় জেলার কাগজের মালিক বা সম্পাদকরা খুব একটা সচেষ্ট নন।

কিন্তু সচেষ্ট হওয়া দরকার। কারণ গ্রামাঞ্চলে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জেলার কাগজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কলকাতার দৈনিক কাগজগুলি কোন জেলার খবরাখবর বিশদভাবে দিতে পারে না, যা জেলাবাসীর জন্য জেলার কাগজগুলি পারে। কলকাতার কাগজ জেলার সব সময় পৌছয় না। জেলার কাগজ কিন্তু ডাক মারফত দূরদূরান্তের গ্রামেও পৌছতে পারে। আমাদের দেশের সংবাদ পত্রের আরো একটি বড় ভূমিকা আছে। আর তা হচ্ছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একসূত্রে বাঁধার। এ কাজে জেলার কাগজগুলি খুবই কাজে লাগতে পারে। এ ছাড়া কলকাতার কাগজের সম্পাদকরা বা সাংবাদিকরা কোন জেলার বিশেষ সমস্যাকে দূর থেকে যতটা না খতিয়ে দেখতে পারবেন, জেলার কাগজের সম্পাদক যেহেতু ওই জেলায় থাকেন, তাঁর পক্ষে ওই বিশেষ সমস্যাকে আরো ভালভাবে খতিয়ে দেখে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। উন্নয়নের কাজে জেলার চাহিদা, বিশেষ সমস্যা ও জেলার মানুষের আশা আকাঙ্খা-এসব সরকারের

কাছে পৌছে দেবার জন্য জেলার কাগজগুলি একদিক দিয়ে জেলার অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিতে পারে। সংবাদপত্র প্রকাশের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কাগজগুলি কিন্তু আজও এই ভূমিকা পালনে যথাযথভাবে সমর্থ হচ্ছে না। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, আধুনিক চিন্তাধারার অভাব, সরকারী উদাসীনতা এবং জেলার কাগজের মালিক ও সম্পাদকদের অব্যবসায়িক মনোভাবই এর জন্য দায়ী। এর মধ্যে প্রধানত দায়ী আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং অব্যবসায়িক মনোভাব। সংবাদপত্র প্রকাশ আজ একটা পেশা। এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। নিজের নাম দশটা লোককে জানানোর জন্য ঘরের পয়সা খরচ করে আর যাই করা যাক না কেন একটা রুচিসম্পন্ন সংবাদপত্র কখনোই প্রকাশ করা যায় না যদি না শেষোক্ত কাজটি করার যথার্থ সদিচ্ছা থাকে। জেলার সংবাদপত্রকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার সরকারী প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের উন্নতিসাধন করে বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলির একাধিপত্য খর্ব করার জন্য অনেক সরকারী পরিকল্পনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু তার কতটা রূপায়িত হয় আর কতটা ঠাণ্ডাঘরে ঢোকে, অভিজ্ঞজনই একমাত্র বলতে পারেন। বাস্তবে আমাদের চোখে কিছুই ধরা দেয় না। যদি কাজের কাজ কিছু সত্যিই হতো তাহলে জেলার সংবাদপত্রগুলি অনেকদিন আগেই একটি সুস্থ সবল চেহারা নিতে পারতো। এখনো সময় আছে। জেলার সংবাদপত্রের উন্নতিসাধনে এই মুহূর্তে যেসব কাজ করা যেতে পারে তার একটা তালিকা নিচে দিলাম। ক্ষুদ্র সংবাদ পত্রের উন্নতির সঙ্গে জড়িত সুধীজন এগুলি নিয়ে ভাবতে পারেন এবং ভেবেচিন্তে যদি রূপায়িত করেন তবে আমার ধারণা ভালই হবে। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় প্রতিটি সংবাদ পত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এবং বহুল প্রচারিত প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের হাত থেকে জনমানসকে মুক্ত করতে হলে জেলার সংবাদগুলির উন্নয়ন ছাড়া গতি নেই।

জেলার সংবাদপত্রগুলির উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করা দরকার।

১) আরো বেশি সংখ্যায় সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া।

২ ব্যাংক থেকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা।

৩) সরকারী অফিসগুলিতে যত বেশি সম্ভব এসব কাগজ কেনা।

৪) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতি সংস্থাকে জেলার সংবাদ-পত্র কিনতে অনুরোধ করা।

৫) নিউজপ্রিন্ট ও ছাপার যন্ত্রপাতি কেনায় সরকারী ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করা।

৬) প্রত্যেক জেলার সরকার তরফ থেকে ছবির ব্লক তৈরী করার একটি ইউনিট স্থাপন।

৭) প্রত্যেক জেলার সদর শহরে প্রেস ইনফরমেশন বুরোর অফিস স্থাপন যেখানে থেকে জেলার সংবাদ পত্রগুলি প্রয়োজনমত খবর সংগ্রহ করতে পারবে।

৮) ভোগ্য পণ্য উৎপাদক ও বিক্রয়ের সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাকে জেলার সংবাদ পত্রে বেশী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করা।

৯) জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০) বহুল প্রচারিত দৈনিকের সঙ্গে জেলার সংবাদ পত্রের দামের সমতা নির্ধারণ করে দেওয়া।

পরিশেষে বলি, উপরোক্ত কাজগুলি যদিও সরকার করবেন জেলার কাগজের উন্নয়নের জন্য, কিন্তু, কোন অবস্থাতেই জেলার সংবাদপত্রগুলিকে সরকারী প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা চলবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে মর্য্যাদা দিতেই হবে। অন্যথায় জেলার কাগজের উন্নয়নের বিশেষ উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

গল্প

মর্যাদা

মৃণাল চৌধুরী

আরেকবার সংসার ত্যাগ করবার তাগিদ বোধ করলো তারিণী।

সনাতন ভারতবর্ষে এমন তাগিদ বোধ করায় অবাক হবার কিছু নেই। বিষয়-বিষে ফুলে ফেঁপে ওঠা তাবড় তাবড় বহু ব্যক্তি এ দেশের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে হামেশাই ছড়িয়ে দেন—সংসার অসার অতি। কত মানুষ এই পরম সত্য বুঝবার জন্য গুরুর ঠেকে গিয়ে মাথা মুড়োয়। কত কসরৎ করে কালে তারাও গুরু ব'নে যান। তারিণীর উপলব্ধি তেমন নয়। তাই লোটা-কম্বল সম্বল করে সংসারের সীমানা ডিঙায়নি। ঘুমের বড়ি অথবা আফিমের বড়ি কিংবা কয়েক ঢোক ফলিডল গিলে নিদেনপক্ষে গলায় দড়ি দিয়ে জীবন নামক ল্যাঠা চুকিয়ে দেয়নি। একটানা ছে'চল্লিশটা বছর এই পৃথিবীতে মানব-সংসার কাটিয়ে চলছে।

তথাপি মাঝে মধ্যেই সংসার-বিরাগ তাকে উশকায়।

নিতান্ত সাধারণ মানুষ তারিণী। মোক্ষ-লাভের তাড়নাটুকু পেয়েছে সে দেশজ আবহাওয়া থেকে। সময়ে বিশেষ করে অসময়ে এ বাসনা তার মনে শান্তি আনে। ইদানীং কাজের জগত থেকে বাতিল হওয়ায় পিতৃসূত্রে পাওয়া বাড়ির বারান্দায় গুম মেরে বসে থাকে তারিণী। নিজের ভূত-ভবিষ্যত নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। আপাততঃ তার মন পিছু হাঁটে।

তখন তার বয়েস ষোলো সুরু হয়ে গেছে। অথচ কিছুতেই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। শেষবার স্কুল থেকে পাশ-না হওয়ার

সংবাদ নিয়ে এসে সন্ধ্যার কিছু আগে দুরন্ত সাজে ফিট-ফাট হয়ে বেরুচ্ছিল বাড়ি থেকে। গন্তব্য ছিল ভবানীপুরে একটা সিনেমা-হল। অশোককুমার-নলিনী জয়ন্তের একখানি ছায়াছবি চলছিল।

শুভ-কাজে বাধা হলো তার বাবা ধরণী শিকদার।

—কার্তিক-কুমার চললেন কোথায়?

তিন মেয়ের পর একমাত্র ছেলে তারিণীর কানে কথাগুলো আর কণ্ঠস্বর খুবই খরখরে শোনালো। কথার জবাব দেবে কি মাথা নিচু করে নিজের সাজ-পোষাক দেখতে লাগলো, জবাব পাবার জন্য ধরণী শিকদারের কোন ব্যগ্রতা দেখা গেলো না।

বললো—বই-পত্তর তাকে তুলে রেখে দাও। আর লোক হাসাতে হবে না।

বিদ্যার প্রতি এমন কোন আসক্তি ছিল না তারিণীর যে দুঃখবোধ করবে। তবু হাতের পুঁজি বেহাত হয় দেখে বলে—লেখাপড়া ছেড়ে দেবো?

—নয়তো কি আরো টাকার শ্রাদ্ধ করাবে।—ওখানেই থামলো ধরণী শিকদার।

অনেক অশালীন অর্থাৎ বাপের পক্ষে ছেলেকে বলা উচিত নয় এমন কিছু কথা বলার পর বলে—যাও, যে চুলোয় যাচ্ছিলে যাও। যা করবার কাল সকালে করবো। আমার ক্ষমতার তো সীমা আছে।

তিলেক বিলম্ব না করে তারিণী বেরিয়ে যায়। তবে বাপের শেষ কথাটা মনের মধ্যে খচখচ করে। জেলা-স্কুল-পরিদর্শকের অফিসের অন্যতম বেয়ারা ধরণী শিকদার করিৎকর্মা লোক। হাতযশ আছে। পয়সাকড়ির জন্য তার দুর্ভাবনা থাকতে পারে ভাবা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়া প্রতিবেশী তার সম্পর্কে যে সব কথা বলে তা শুনেছে তারিণী। তারিণীর তিন দিদির পয়সাওলা তিন বর কিনতে ধরণী যে ভাবে টাকার হরির লুট লাগিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে কেচ্ছা রটে গেছে।

তাই বোধহয় বাড়িটা দোতলা হতে গিয়ে থমকে আছে। অর্থাৎ অমন যে করিৎকর্মা ধরণী শিকদার তারও হাঁপ ধরে গেছে।

স্কুলের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও বৈষয়িক বাপের কর্মকাণ্ড দেখে অনেকটাই পোক্ত তারিণী। পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করে। মোড়ের পান সিগারেটের দোকানটার সামনে এসে ভাবনা থমকায়। প্রথমে কিমাম দিয়ে একটা পান খায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তার মনে হয় একতালা

বাড়ি দোতালা হবেই। কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করলে ধরণী শিকদারের ছেলেকে আটকায় কে? বাবার রাগ জল করার মতলব আঁটে সে। ভোর ভোর সময়ে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে "বাংলা পদ্য" পড়বে।

বাংলা পদ্য পড়বার কথাটা ভুলিয়ে দিয়েছিল পর্দায় নানা পরিস্থিতিতে অশোককুমার নলিনীজয়ন্তের কাজ-কারবার।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙালো ধরণী শিকদার। সব কিছু ঠাহর করবার আগেই সে বাবার পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলো বাঁকাশ্যাম বোসের বৈঠকখানায়। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাঁকাশ্যাম বোস। স্বদেশী করত নাকি এক সময়। বিলেতী লেথার কালি হটিয়ে দেশী কালি চালু করে দেশসেবা করছে এখন। হাসিমুখে তার সংগ্রাম আর সাফল্যের ঝুড়ি ঝুড়ি কথার পর তারিণীর পিঠে হাত রেখে বললো—তোর ছেলে তো লায়েক হয়ে গেছে রে। চালাক চতুরই মনে হয়।

বাপের চোখের ইংগিতে তারিণী টিপ করে প্রণাম করে তাকে।

বাঁকাশ্যাম বোস বলে—বুঝলে তারু তুমি হবে অফিসের লোক। অফিস ঘরেই বসবে। তোমাকে তো আর মজুর বানাতে পারি না। অত খাটা-খাটুনি তোমার পোষাবে না। তা ছাড়া ভদ্দরলোকের মান মর্যাদা বলেও একটা কথা আছে।

মাস তিনেক কাজ করবার পর থিঁতিয়ে নিজের অবস্থা ভাবলো তারিণী। প্রায় চোখ ফেটে জল এলো, ম্যাট্রিকটা পাশ করবার সুযোগটা হাত ফসকে যাওয়ার জন্য। বাঁকাশ্যাম বোস বলেছিল তুমি অফিস ঘরে বসবে। তা বসে! তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য। সারাটা দিন যায় দম দেওয়া চরকির মতো ঘুরে ঘুরে সকলের ফুট-ফরমাস তামিল করতে করতে সে ভাবে মজুরের খাটুনি কি এর চাইতে খুব বেশী?

তবু দিন চলছিল। কালি-বেচার দেশসেবায় অভাবিত সাফল্য বাঁকাশ্যাম বোসের ফলাও কারবারের চেহারা বদলে দিলো। তালে তাল মিলিয়ে তারিণী হলো কোম্পানীর এক নম্বর বেয়ারা। মাইনে বাড়লো। কিন্তু উর্দি পড়ার হুকুম হলো। কেঁদে বুক ভাসালো তারিণী। পুরানো লোক, বন্ধুর ছেলে বলে রেহাই পেলো সে। ধরণী শিকদারের মতোই টুইলের হাফ-শার্ট আর ধুতি পরবার অধিকার বজায় রইলো। কিন্তু—

আল-জিভের কাছে ছোট মাছের কাঁটা বিঁধে থাকার মতো যন্ত্রণা বিদ্ধ হয়ে

গেলো জীবন ধারণ। তখন—

যথার্থই সংসার অসার অতি ভাবনার উশকানিতে গৃহত্যাগী হ'বার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল তারিণীর। কিন্তু—

ছেলের মতিগতি, ভাবভঙ্গি ধরণী শিকদারের চোখে ভালো ঠেকলো না। তবে সে করিৎকর্মা লোক। ঘুসঘুসে ভাবনার ধার ঘেঁসে না। এক মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিলো। বর্ধমানের এক গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকের এইট-ক্লাস ফেল মেয়ে শিবানী। গোলগাল, নরম নরম, চাপা গৌরবর্ণা প্রায় যুবতী মেয়ে। কয়েক মুঠো টাকা আর গা ভর্তি গয়না নিয়ে বৌ হয়ে এলো। আদুরে আদুরে মুখের শিবানীকে পেয়ে কোন ফাঁকে তারিনী সনাতন ভারতীয় মুক্তির বাসনা ত্যাগ করলো টেরই পেলো না। গত বছর অবধি স্বপ্নেও ভাবেনি সংসার-অরণ্য পরিত্যাজ্য।

এদিকে সন্ধ্যা নামছে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। কয়েক ঝাঁক মশা মুখে গায়ে যেমন খুশি নাচানাচি করছে। ফলে তারিণীর ভাবনা চিড় খায়। বিড়ি টানবার ইচ্ছে চাগিয়ে ওঠে। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থেকেই মুখ ঘুরিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকে—অবুর মা দেশলাই দিয়ে যাও।

ভেতর থেকে সাড়া আসে না। তবে অবু'র মা শিবানী আসে। তারিনীর হাতে দেশলাই দিয়ে বলে—একটু আধটু নড়ে বসলেও তো পারো।

বিড়ি ধরাতে গিয়ে থামে তারিণী। বলে—সবে তো একটা বছর যায়—রি কাজটা নেই। না নড়ে, বসেই এতকাল সংসার চালালাম বুঝি।

শিবানী লজ্জিত হয়। —ও কথা বললাম নাকি? বলছিলাম দিন নাই রাত নাই কেবল বসে বসে থাকলে শরীর টেঁকে নাকি!

কথা বাড়ায় না তারিণী। আপাততঃ বিড়ি টানাই জরুরী মনে হয়।

শিবানী চলে যায়। কয়েকটান বিড়ির ধোঁয়া গিলে আর উড়িয়েও শিবানীর কথাগুলোর পোড়ানি যায় না। স্বদেশী লেখার কালির কারখানায় পুরানো লোক সরানো হবে—এমন একটা কানাঘুসো চলছিল। মাথা ঘামায়নি তারিনী। একদিন কোম্পানীর ছোট-সাহেব রাধাশ্যামের টেবিলে একটা ফাইল রাখতে গিয়ে জলের গ্লাস উলটে ফেলে তারিণী। সঙ্গে সঙ্গে রাধাশ্যাম বিরাশী সিক্কার একখানি চড় কষায়। দীর্ঘকাল পর এমন একখানি চড় খেয়ে তারিনী ভিরমি খায়। মাটিতে পড়ে না। স্তব্ধ হয়ে থাকে। ছুটে আসে অন্য রেয়ারারা। কেরানীবাবুরা কলম বন্ধ করে ড্যাব ড্যাবে চোখে তাকায়।

রাধাশ্যাম গর্জে ওঠে কাজে গাফিলতী এবং আরো কয়েকটা মারাত্মক ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বেরিয়ে যাবার হুকুম দেয়। শেষ অবধি নেপালী দারোয়ান তাকে কারখানার বাইরে রেখে আসে। অনেক সাধ্য সাধনা করেও বকেয়া টাকা ছাড়া আর চাকরী ফিরে আসে না।

তার কয়েকমাস পরেই ছেলে অবনী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলো। বহু কষ্টে ছেলেকে কলেজে ভর্তি করার জন্য টাকা সংগ্রহ করলো।

কিন্তু অবনী এসে বললো—কলেজে ভর্তি হবো না।

বিস্ময়ে হাঁ হ'য়ে যায় তারিণী। পাশ দেওয়া ছেলে বলে—পড়বো না। ফেল দেওয়া সে পড়া বন্ধ হওয়ায় কেঁদেছিল। চমকের ধাক্কার রেশ মেলানোর পর বলে—পাশ দিলি; পড়বি না কেন? চাকরী বাকরী পাবি কি করে?

বাপের দিকে তাকিয়ে অবনী বলে—পাশ হয়েছিতো রয়াল ডিভিশনে! কত ভালো ভালো ছেলে, বি. এ. এম এ. পাশ ছেলে চাকরী না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। খামোখা টাকার শ্রাদ্ধ হবে।

—টাকার কথা ভেবে লেখাপড়া বন্ধ করতে হবে? যেমন করে হোক তোর পড়ার খরচা আমি জোটাবো। ভাবিস্ না। ধরণী শিকদারের ছেলে তারিণী শিকদার এখনো বেঁচে আছে রে! তারিণী কথাগুলো বলতে বলতে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। বোধহয় কতটা জীবিত আছে ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে চায়। অবনী বাপের উত্তেজনা লক্ষ্য করে সতর্ক হয়। খানিক সময় পরে বলে—একটা কাজ ধরে নি। রাতের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাবো।

—কাজ করবি? কি কাজ পাবি? কুলি খাঙড়ের কাজ করবি নাকি? বংশের মান-সম্মানটাও রাখবি না? এখনো তো আমি মরিনি।

ধরণী শিকদারের মতো দাপটে কথা বলতে পারে না তারিণী। তথাপি তার কথাগুলোয় এবং বলার ভঙ্গীতে চাপা গর্জন আর ঝাঁঝ টের পাওয়া যায়।

অবনী ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। কথা বলে কম। বাপের কথাগুলোর রেশ মিলিয়ে যাবার পর বলে—খেটে খাবো। কাজ পেলে কারখানায় খাটবো। অফিসে যারা কাজ করে তারাও খাটে বলেই মাইনে পায়।

বাপকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে অবনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু বলতে গিয়ে থামতে হয় তারিণীকে। শিবানী যে কিছুই বোঝে না সে'ও ফোঁড়ন কাটে—তাগদ ঢেলে রোজগার করা ঢের ভালো। ঘাড়গুঁজে অন্যের হুকুম তামিল করা গোলামি আবার চাকরি নাকি! আমার বাপু সোজা কথা।

শিবানীর সোজা কথা যথাস্থানে বেঁধে। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে তারিণী। আরেকবার তার সংসার ত্যাগ করবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে।

সংসার বলতে তো তিনজন। তার দু'জন অবনী আর তার মা শিবানী। মায়ে-পোয়ে যদি সর্বক্ষেত্রে তারিণীর মতামতের তোয়াক্কা না করে, কোন কথা তাকে আগে না জানায় সংসারবাসী হয়ে থাকবার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলেজে ভর্তি হলো না অবনী। কাজ খুঁজছে আভাস পায় তারিণী গুম হয়ে থাকে। একদিন, সকাল তখন সাড়ে আটটা ন'টা হবে। তারিণী বারান্দায় তার নির্দিষ্ট কোণে গুম হয়ে বসেছিল। সহসা অবনী এসে টিপ করে প্রণাম করলো। হতচকিত তারিণী। বুকটা তার ধড়াস করে উঠলো। আজকালকার ছেলে। জোয়ান ছেলে। তার ব্যবহারে ছেলেটি ঘর ছাড়ছে নাকি? আগের রাতে কুলি-মজুর বন্ধুদের সাথে অতিরিক্ত মেলা-মেশার জন্য ছেলেকে বকেছিল তারিণী। বলে দিয়েছিল সাফ কথা—ওদের সঙ্গ যদি ছাড়তে না পারিস্ নিজের পথ দেখ। এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না। তাই কি অবনী···ভাবতে পারে না আর। তারিণীর বুকের মধ্যে ব্যথা গুমরায়। ছেলের মুখের দিকে তাকায়। ছেলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শিবানীর মুখে চোখে কোনো ভাবান্তর নেই। মুখখানা হাসি হাসি। বোধহয় ছেলের সঙ্গেই যাবে। বেতো বাতিল ঘোড়ার জন্য কে আর দরদ রাখে মনে।

তারিণী ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করে—চললি কোথায়?

—ইণ্টারভিউ দিতে যাই।

অবনীর জবাব শুনে ধড়ে প্রাণ আসে তারিণীর। ধাতস্থ হয়। কোথায়, কি চাকরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিতে চলেছে ছেলে, জানতে চায় না। ছেলের জামা-প্যাণ্টের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—এমন জামাকাপড়ে ইণ্টারভিউ?

অবনীর কিছু বলবার আগে শিবানী বলে—আর আছে নাকি?

শিবানীর কথার তেরছাটান ক্ষুব্ধ করে তারিনীকে।

সে বলে—টিপ্পনি না করে সময় মতো বললে হতো না।

বাবা আর মায়ে ঠোকাঠুকি লেগে যাবার আশংকায় অবনী আগ বাড়িয়ে বলে—বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার অবস্থা যা চলছে ভেবেই বলিনি।

একেবারে তার ক্ষমতা তুলে মন্তব্য! তারিনীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ছেলের দিকে তাড়া করে যায়। তার গালে চড় কষায়। রাগে গরগর করতে

করতে বলে—

—তিরিশটা বছর সংসার টানছে কে? জামা জুতো, মুখের গরাস জুটিয়ে আনছি না? যত বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা।

হা হা করে ছুটে আসে শিবানী। তারিণীকে লক্ষ্য করে বলে—ক্ষেপে গেছো নাকি! কোথায় ছেলেটাকে আশীর্বাদ করবে তা নয় মারছো!

অবনীর গালে হাত বুলোতে শিবানী বলে—খুব লেগেছে।

—না।

কথাটা বলে ছলোছলো চোখে অবনী নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে রাগের তাপ কমে আসতে থাকে তারিণীর। অনুতাপ জমতে থাকে।

খানিক পরে বলে—তুইই বল এমন পোষাকে কেউ ইণ্টারভিউ দিতে যায়!

অবনী বলে—উপায় কি! কাজ-কাম জোটে না। বেটারা যেমন রেখেছে, ছেঁড়া কানি পড়ে যে যাচ্ছিনা ওদের ভাগ্যি।

ক্ষীণ হাসির আভা দেখা যায় তারিণীর চোখে মুখে। সে বলে—তোর যে কথা! এতকাল কি বেটারা সব যুগিয়েছে নাকি? সব জোটাতে হবে এই শর্মাকেই।

—সে তো জানা কথা। বেটারা সে পথেও বাদ সেধেছে।

এর পর বাপ বেটা কারো কোন কথা থাকে না। কাজ খুইয়ে ঘরবন্দী হবার পর থেকে মন্তব্য করতে ছাড়েনি কেউ। এমন কি শিবানীও, যতো জ্বালা বেড়েছে, ততো ঠুকরেছে। স্বীকার করতেই হবে অবনী ব্যতিক্রম। এ কারণে কোন কটাক্ষ করেনি। অক্ষম বেকার বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অপমান করেনি। বরঞ্চ বলেছে—বুঝলে বাবা এই হলো ওদের কায়দা। কাজ ফুরিয়ে গেলে পথে বসিয়ে দেবে। তার আগে চুষে নেবে আঁটি পর্যন্ত।

অবনীর কথাগুলো অযৌক্তিক মনে হয়নি। তবু ছেলের মুখ থেকে এমন দরদভরা কথা শুনতে শুনতে বুকটার মধ্যে মোচড় লাগে। হু হু করে। হঠাৎ ছেলেটা বাপের মতো বল ভরসার আশ্রয় মনে হয়।

ভদ্রলোকের ছেলের উপযুক্ত নয় এমন জামা-প্যাণ্ট পরেই অবনী ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। চাকরীটা অবশ্য হয়নি। জামা-কাপড়ের দোষে কিনা তা হলপ করে বলতে পারবে না তারিণী।

সংসারের অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় ওঠে। ছেলের একটা হিল্লে করে দেবার জন্য তারিণী যায় দীননাথ ঘোষালের কাছে। বাল্যবন্ধু দীননাথের

বাপের কারখানা এখন বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। দীননাথ তারিণীর সম্মান রাখে। অবনী পাকাপোক্ত মজুর হয়ে যায়। মনটা যে খচখচ করেনি তা নয়। তবে বাবা ধরণী শিকদারের মতোই ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারায় খুশী খুশী লাগে তরণীর।

মাস কয়েক কাজ করবার পরই গোলমাল পাকালো অবনী।

দীননাথ এক ছোকরা মজুরকে কান ধরে টেনেছিল। তার কারখানা। তার পয়সায় খাটছে মজুররা। তাকেই গিয়ে শাসালো মজুরেরা দল বেঁধে। সবার আগে আগে তারিনীর ছেলে অবনী। চিৎকার চেঁচামেচি—সারা কারখানা জুড়ে একটা কথা—দীননাথকে ক্ষমা চাইতে হবে।

পুলিশ এলো। তবু ক্ষমা চাইতে হলো দীননাথকে।

ঘরে এলে, ছেলেকে বোঝালো তারিণী। দীননাথকে ধরেই তোর কাজ হয়েছে।

—কাজ না জানলে তো রাখেনি!

ছেলের জবাব শুনে পিত্তি জ্বলে। কথা ঘুরিয়ে তারিণী বলে—অন্যের ব্যাপারে তোর নাক গলানোর দরকার কি?

—একজনকে আজ হেনস্থা করতে পারলে, কাল সকলকে হেনস্থা করবে মালিক। আর একজন মজুরকে হেনস্থা করলেই সকলে রুখে দাঁড়াতে হবে। সে জন্যই তো ইউনিয়ন।

দীননাথ ছাড়বার পাত্র নয়। ইউনিয়নের যতো বড়ো পাণ্ডাই হও না কেন মালিক, মলিকই। কারখানায় গোলমাল পাকানোর দায়ে দীননাথ ছাঁটাই করে দিলে অবনী আর তিনজনকে।

দীননাথের কাছে দরবার করতে যেতে চেয়েছিল তারিণী। অবনী সিধে বলে দিয়েছে—তুমি যাবে না।

যায়নি তারিণী। তিনমাস ছাঁটাই হয়ে পড়ে আছে অবনী। মজুররা দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। দীননাথও কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সব শুনে তারিনী ছেলেকে বলেছে—এবারে বোঝ ব্যাপারটা।

—অপেক্ষা করো বাবা। তোমার বন্ধুকেই বুঝতে হবে।

অবনী রোজগার করা বন্ধ করেনি। খবরের কাগজ ফেরি করছে এখন। ভদ্রলোকের ছেলে। বি. এ. এম. এ. পাশ না দিক; একেবারে মূর্খ নয়। এ কাজে মান-ইজ্জত থাকে!

অবনীর কোন মাথাব্যথা নেই। অম্লানবদনে বলে—মেহনত করলেই মান-ইজ্জত থাকে। যারা পরের মেহনতে খায়, চুরি-চামারি করে, পরকে ঠকিয়ে খায় তাদের ইজ্জত থাকে না।

গুরুঠাকুরের উপদেশবাণী বিতরণের মতো মনে হয়েছে অবনীর কথাগুলো। কিন্তু লজ্জায় সিঁটিয়ে গেছে তারিণী। পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না।

* * * *

তারিণী বারান্দায় বসেছিল।

শিবানী আসে। তাকে উদ্দেশ্য করে বলে—তুমি কিন্তু নেমন্তনে যাবে না। অবনী বার বার করে বলে গেছে।

—তিনি কোথাও গেছেন?

—ওদের ইউনিয়নের মিটিং আছে। তারপর মালিকের সঙ্গে বসবে শ্রমমন্ত্রীর ঘরে।

—তিনি হুকুম দিয়ে যাবেন আর আমি আমার বন্ধুর বাড়ি যাবো না? আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই?

—ঠিকমতোন নেমন্তন্ন করলে বলবার কথা ছিল না। নয়তো অবনী তেমন ছেলে নয় যে বাপকে হুকুম করবে।

শিবানীর কথার পিঠে কথা বলে না তারিনী। দীননাথের নেমন্তন্ন করার দৃশ্য মনে পড়ে। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল দীননাথ। তারিণীর বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরে তার আত্মীয়বাড়ি। তড়াক করে রাস্তায় তার সামনাসামনি গিয়ে হাজির হয় তারিণী।

—ভালো আছো তারিণী?

—ওই একরকম। তুমি এ পথে?

—ভাইপোর ওখানে যাবো। ছোট-মেয়েটার তো বিয়ে ক'দিন পর..... কথা সম্পূর্ণ করবার আগেই থেমে যায় দীননাথ। মনে পড়ে যায়—চিরকাল তার বাড়ির কাজকর্মে নিমন্ত্রিত হয় তারিণী। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সে থিঁতিয়ে ভাবে।

তারিনীও কিছু বলবার পায় না।

খানিক পরে দীননাথ বলে—শোনো এই শুক্রবারে বিয়ে। তাড়াহুড়োয় বেরুতে গিয়ে কার্ড সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি। দিয়ে যাবো। যদি নিজে না আসতে পারি ছোট ছেলে বুবাইকে দিয়ে পাঠালে আবার ত্রুটি ধরো না।

যেও, অবশ্য যাবে কিন্তু।

কথা কটা বলে হাঁটা সুরু করেছে দীননাথ। কয়েক পা সঙ্গে যেতে যেতে তারিণী বলেছে—তোমার আমার সম্পর্ক কি অমন ত্রুটি ধরবার।

না দীননাথ, না তার ছোট ছেলে বুবাই—কেউ আসেনি। ডাকযোগেও আমন্ত্রন পত্র আসেনি। ও বাড়ীতে নেমন্তন্নে যাবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তার ছিলই না সে কথা বলেছে শিবানীকে। কিন্তু—

এখন শিবানী, অবনীর হুকুমজারী করায় সে স্থির করে যাবে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই লোডশেডিংএ সমস্ত তল্লাট অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অবনীর বিপরীত তারিণী। অবনীর পোষাকের পারিপাট্য কিংবা সাজগোজ করবার কোন ঝোঁক নেই। তারিণী ফিটফাট। ধুতি পাঞ্জাবী নিজে হাতে কেঁচে,ইস্ত্রী করে ফিটফাট হয়ে বেরোয় সে। অনেক দিন পর তার নিজেকে আবার নিপাট ভদ্রলোক মনে হয়।

দীননাথের বাড়ির জোরালো আলোর বন্যার সামনাসামনি এসে নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকায় সে। বড়ই মলিন লাগে। অথচ বাক্সে ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী আছে। শিবানীকে বলতে হবে বলে বের করা হলো না দীননাথের বাড়িতে ঢুকতে তার পা উঠে না।

খানিক দূরে অনেক মানুষের একসঙ্গে চলার তালে, কথার তোড়ে ভেসে আসে কলরব।

দীননাথের ব্যক্তিগত পয়সার জোরে ছড়িয়ে দেওয়া জোরালো আলোর সীমানা ছাড়িয়ে, খানিক দূরে লোডশেডিং-এর আওতার একটা ঘরের আড়ালে এসে দাঁড়ায় তারিণী। আওয়াজটায় তার কেন জানি মনে হয় অবনী আসছে তার কুলিমজুরগুলোকে নিয়ে। বিয়ে বাড়ির সামনে হল্লা বাঁধাবার মতলব করেছে বুঝি—তারিণীর ধারনা একেবারে ভুল নয়।

দীননাথের কারখানার মজুরেরা এসেছে—সবার সামনে তার পুত্র অবনী।

আর কাণ্ড ছাখো! দীনাথ এসে সাদরে ডেকে নিচ্ছে তাদের। অবনীর তো দুটো হাত জড়িয়ে ধরেছে। আর কত কি বলছে দীননাথ। কথাগুলো শোনা যায় না। তবু শোনবার জন্য ব্যাকুল হয় তারিণী। খানিক পরে তারিণী উলটো পথ বাড়ির পথ ধরে সে।

বাড়ির বারান্দায় এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হয়। সচকিত তারিণী প্রশ্ন করে—কে?

—আমি। আমি অবনী।

—আয় বাবা।

—ছু'এক পা বাপের দিকে এগিয়ে যায় অবনী। বলে—বাবা আমরা জিতে গেছি। লক-আউট উঠে গেছে। সব কজনকে কোম্পানী কাজ ফিরিয়ে দিয়েছে। তিন কিস্তিতে মিটিয়ে দেবে বকেয়া পাওনা। সোমবার থেকে কারখানা খুলছে। বলেছিলাম না তোমার বন্ধুকে মাথা হেঁট করতে হবে।

—বলেছিলি বটে—আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় তারিণী। কেন না বিজয়ী ছেলের জন্য তার কণ্ঠনালীতে আবেগ থর থর করে। অনেক আয়াসে শেষ অবধি বলে—খানিক আগে যে সোরগোল শুনলাম, তাহলে তোরাই ফিরলি!

—আমাদের নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে।

—তুই চলে এলি কেন?

—তোমার বন্ধুর বাড়ি। চিরকাল তোমাকে নেমন্তন্ন করে। এবার আমার জন্য তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি। আমি ওর নেমন্তন্ন নেবো কেন? সকলকে পৌছে দিয়ে চলে এলাম।

অবনীর কথার জবাব দেওয়া হয় না তারিণীর। তার ছু'চোখ ভরে আসে জলে। তার কান্না বাগ মানে না। ছেলের বিজয়-গর্বে নয়, তার সম্মান বাঁচানোর জন্য মালিকের নিমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করেছে অবনী সে জন্যও নয়—তারিণী কাঁদে অন্য কারণে সে কাঁদে আর ভাবে, সেদিন স্বদেশী লেখার কালির কারখানায় যদি অবনীরা থাকতো? তবে আজ এমন বাতিল, বেতো ঘোড়ার মতোজীবন বুঝি হতো না তার।

নানা জল্পনা কল্পনা, নানারকম নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যতবাণীকে ব্যর্থ প্রমাণ করে ভারতে নবম এশিয়ান গেমস-এর এই বিপুল সাফল্য কি ক'রে সম্ভব হলো?

"সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম"-এর ফলে। এই স্মরণীয় উদ্ধৃতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। নতুন ২০ দফা কার্যসূচী উদ্বোধনের সময় তিনি এই আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই মনোভাব নিয়ে মিলেমিশে কাজ ক'রে আমরা রেকর্ড সময়ে বিশাল স্টেডিয়ামগুলি তৈরী করেছি এবং দক্ষতার সঙ্গে খেলার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াডের জন্য আমরা যা করেছি, আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং নতুন ২০ দফা কার্যসূচীর জন্যেও আমরা তা করতে পারি।

শক্তিশালী দেশ গঠনে আসুন
আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

davp 82/559

BIVAV

Price Rs. 5.00 | April—June 83 | Regd. No.
Vol. 6 No. 3 | | R. N. 30017/76

The West Dinajpur Spinning Mills Ltd.

(A Govt. of West Bengal Undertaking)

Now that the Construction of the Spinning Mill Complex at Raiganj, Dist. West Dinajpur is going on in full swing and orders for machinery had already been placed, it is a certainty that the project as part of rural industrialisation programme of the Govt. of West Bengal will be completed soon.

On completion of the project, the objectives to be achieved are :

1. Yarn production on full capacity working — 23,50,000 kgs per year worth Rs. 6 Crores.

2. Employment potential — 1000 persons directly during full utilisation of the installed capacity (25,000 spindles).

3. Meeting the yarn needs of the handloom units of North Bengal which find yarn shortage a big constraint to their growth.

4. As a big industrial unit (first in North Bengal) it will promote industrial activity in the region and many ancillary industries will grow.

Mill Site Office :
Village—Bogram, P.O. Karnajora
Raiganj, Dist. West Dinajpur
Cable : DINAJSPIN
Phone : Raiganj—104

Regd. Office :
2, Church Lane (2nd floor),
Calcutta-700 001
Phone : 24-8867 & 23-8247
Cable : DINAJSPIN